পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

বর্ষার মাঝামাঝি।

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্তরাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়। একসময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে গ্রামে রেলস্টেশনে ও জাহাজঘাটে শান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনও নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।

কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।

আরও দুমাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম।

নৌকাটি বেশি বড়ো নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু-তিন জনে কোনোরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষ সীমার বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়।

গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুটি বাঁশে বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট হাঁ-করা জাল নামাইয়া দেওয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নীচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়।

এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে। পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া ও শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিয়া, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির

দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে। নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়। বইঠা ধরিয়া নৌকাকে তারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একবার একেবারে ঝাঁকের মধ্যে জাল ফেলিয়া বেশি মাছ উঠিয়াছিল। আজ খুব মাছ উঠিতেছিল। কিন্তু ভোরে দেবীগঞ্জের মাছের দর না জানা অবধি এটা সৌভাগ্য কিনা বলা যায় না। সকলেরই যদি এরকম মাছ পড়ে, দর কাল এত নামিয়া যাইবে যে বিশেষ কোনো লাভের আশা থাকিবে না। তবে বড়ো মাছের বড়ো ঝাঁক একই সময় সমস্ত নদীটা জুড়িয়া থাকে না, এই যা ভরসার কথা। বেশি মাছ সকলের না-ও উঠিতে পারে।

কুবের হাঁকিয়া বলে, যদু হে এ এ এ—মাছ কিবা?

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, জবর।

জবাবের পর সে-নৌকা হইতে পালটা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাদেরও মাছ পড়িতেছে জবর।

ধনঞ্জয় বলে, সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামবো। হালার মাছ ধইরা জুত নাই।

কুবের কিছু বলে না। ঝপ করিয়া জালটা জলে ফেলিয়া দেয়।

শরীরটা আজ তাহার ভালো ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাকে এমনিভাবে দু আনা চার আনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরশুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীন সন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যারা পাতিতে পারে তাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড়ো পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মতো গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থায় যে মাছ পড়ে তার দু-তিন আনা ভাগে কারও সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এই ইলিশের মরশুমে। শরীর থাক আর যাক এসময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।

মাঝরাত্রে একবার তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, একটু জিরাই গো আজান খুড়া।

জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত্ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।

কুবের বলিল, উঁহুঁ, তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। দেহখান জানো গো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভালো নাই।

জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছইয়ের সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোটো হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কিটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল। বারো বছর বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া হাত একেবারে পাকিয়া গিয়াছে।

নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।

এক হাতে তীরের দিকে কোনাকুনি হাল ধরিয়া ধনঞ্জয় অন্য হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, দে কুবের, আমারে দে, ধরাই।

কলিকাটি তাহার হাতে দিয়া কুবের রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্যসত্যই শীতকাল।

হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কি জাড় কুবির!

কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কারও সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁচা দিয়া গণেশ আবার বলিল, জানস কুবির, আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম।

এদের মধ্যে গণেশ একটু বোকা। মনের ক্রিয়াগুলি তার অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। সে কোনো কথা বলিলে লোকে যে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথাটা কানে তোলে না এইটুকুও সে বুঝিতে পারে না। একটা কিছু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বারবার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে। ধমকের মতো করিয়া যদি কেউ তার কথার জবাব দেয় তাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ।

কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটোবড়ো সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। এক পক্ষের এই আনুগত্যের জন্য তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠই বলিতে হয়। দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখদুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া তাহাদের হয় খুব কম।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে। কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুঁকাটি ছইয়ে টাঙাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বইঠা ধরিল।

গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, একখান গীত ক দেখি কুবির?

হ, গীত না তর মাথা।

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন

দিয়া গানের কথাগুলি শুনে। যে যাহারে ভালোবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। বড়ো সহজ গান নয়।

পুবদিক লাল হইয়া ওঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল। তারপর রওনা হইল জাহাজঘাটের দিকে। সেখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল।

নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া স্টিমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে। সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোনো স্টিমার ছাড়িয়া যায়, কোনো স্টিমার ভেড়ে গিয়া জেটিতে। কলিকাতা হইতে মেল ট্রেনটি আসিয়া পড়িয়াছে। ঘাটের ও স্টেশনের দোকানপাট সমস্ত খোলা হইয়াছে। অনেকে নদীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছে। মোটবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোটোবড়ো নৌকা ঘাটে ভিড় করিয়া আসিয়াছে। ঘাটের দুদিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায় পোঁতা লগির সঙ্গে বাঁধা আরও যে কত নৌকা তার সংখ্যা নাই।

নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ।

মেছো নৌকার ঘাটটি একপাশে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লইয়া হাজির হইয়াছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চলিতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

এই ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের প্রতিদিন খুশি হইয়া উঠে। আজ সে একেবারে ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। শেষরাত্রির দিকে শীত করিয়া বোধ হয় তাহার জ্বরই আসিয়াছে। চোখ দুটো যে তাহার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে চার-পাঁচবারের বেশি।

নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোটো ময়লা কাপড়খানি পরিয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। একশ মাছ গোনা হইবামাত্র তার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটি মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে ভরিয়া ফেলিতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে এক সারি মাছ ও এক পরল করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানের ব্যবস্থা হইতেছে। খানিক দূরে মেন লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা একজোড়া উঁচুনিচু ও প্রায় অকেজো লাইনের উপর চার-পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝাই লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌঁছিবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ!

একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটে ও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল, কী কন?

সে রাগ করিয়া বলিল, কী কন! কী কই জানস না? মাছ লইয়া আয়, তিনডা আনিস।

মাছ তো নাই শেতলবাবু।

নাই কী রে, নাই? রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়া আয় গা, যা। বড়ো দেইখা আনিস।

কুবের মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গা আইজ।

কিন্তু কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয় বাজারে কিনিতে গেলে তার তিনগুণ দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না।

সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের। অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশিই লইস, আঁই?

তালি খানিক খাড়াও শেতলবাবু।

কুবের ফিরিয়া গিয়া কাপড়টা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারিদিকে চেনা লোক কম নয়। চুপিচুপি মাছ লইয়া তাহাকে তীরে উঠিতে দেখিলে নিশ্চয়ই সন্দেহ করিবে। লজ্জার তাহার সীমা থাকিবে না। তবে একটা ভরসার কথা এই যে সকলেই নিরতিশয় ব্যস্ত। নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটা মাছ চুরি করিতেছে তাকাইয়া দেখিবার অবসর কাহারও নাই। চারিদিকে নজর রাখিয়া তিনটা মাছ কুবের একসময় গায়ের কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই মাছ কটা সে চটের থলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

পয়সা কাইল দিমু কুবের।

বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, রন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইয়েন না। দামটা দ্যান দেখি।

কাইল দিমু কইলাম যে?

অঁই, অখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?

পয়সা নাই তো দিমু কী? কাল দিমু, নিয্যস দিমু।

পিছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়া আঙুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শীতল চলিয়া গেল। আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কুবের বলিল, হালা ডাকাইত! বিড়বিড় করিয়া শীতলকে আরও কয়েকটা গাল দিয়া কুবের নৌকায় গিয়া গলুইয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গণেশটা বোকা। মাছের দাম বুঝিয়া পাওয়ার সময় একটু চেষ্টা করিয়াই ধনঞ্জয় তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিয়াছিল। একা একা দাম লইবার সুযোগ সে কোনোদিনই প্রায় পায় না। কুবের এই সময়টা জোঁকের মতো তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। টাকা পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগটা বুঝিয়া লয়।

ধনঞ্জয় নৌকায় আসিলে মাথা উঁচু করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কতটি মাছ হইল আজান খুড়া? শ চারের কম না, এ্যাঁ?

ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, হ, চাইরশ না হাজার। দুইশ সাতপঞ্চাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশর দাম দিছে।

কুবের উঠিয়া বসিল।

ইটা কী কও খুড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুইশ সাতাইশটা মাছ হইছিল?

ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ করিয়া বলিল, মিছা কইলাম নাকি রে কুবির? জিগাইস না, গণেশ আইলে জিগাইস।

কুবের নরম হইয়া বলিল, জিগানের কাম কী? তা কই নাই খুড়া। মিছা কওনের মানুষ তুমি না। মাছ নি কাল বেশি বেশি পড়ছিল, তাই ভাবলাম তোমারে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।

ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলন-পিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটোলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটোলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।

গণেশকে ধনঞ্জয় চিড়া কিনিতে পাঠাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিলে নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখন বইঠা না ধরিলেও চলে। উজান স্রোতের টানে নৌকা আপনি গ্রামের দিকে ভাসিয়া চলিবে। গণেশ ও ধনঞ্জয় গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া চিবাইতে লাগিল। কুবের কিছু খাইল না। কেবল কয়েক আঁজলা নদীর জল পান করিল। নদীর বুক জুড়িয়া এখন ভাঙা ঢেউগুলির মাথায় অসংখ্য সূর্য জ্বলিয়া উঠিতেছে। কাকচিলা মাছরাঙা প্রভৃতি পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট সংকেতের মতো একটি স্টিমারের ধোঁয়া চোখে পড়ে। আকাশ উজ্জ্বল ও নির্মল। মেঘের চিহ্নও নাই।

গণেশ সহসা মমতা বোধ করিয়া বলে, না আইলে পারতি কুবির আইজ। কুবের কোনো জবাব দেয় না। নিঃশব্দে থাকে।

গণেশ বলে, মাথাটা টিপা দিমু নাকি?

কুবের বলে, অঁ হঁ।

গণেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলে, হাল ধইরা যদি বইবার পারস কুবির, খুড়া আর আমি বইঠা বাই, তড়াতড়ি পৌছান যায়।

পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে।

তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচেকানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।

দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না। এ দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দুরে ঠেলিয়া রাখে, ও দিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লিতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারিদিক জলে জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এই সময়ে মানুষের বাড়িঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যেবার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেবার রেহাই পায় না। পথঘাটের চিহ্নও থাকে না। একই গ্রামে এ পাড়া হইতে ও পাড়ায় যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকার। কয়েকদিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উঁকি দিতে আরম্ভ করে কিন্তু আরও এক মাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এ দেশে একরকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।

নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা ফসল-কাটা রিক্ততা। মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।

নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনও শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কে

জানে। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনোদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।

জেলেপাড়া নদী হইতে বেশি দূরে নয়। তবু এইটুকু পথ চলিতেই কুবেরের কষ্ট হইতেছিল। নৌকায় সমস্ত পথটা আবোল-তাবোল বকিয়া গণেশ এতক্ষণে চুপ করিয়াছে। ধনঞ্জয় নৌকা হইতে নামে নাই। পাশের গ্রামে কুটুমবাড়িতে তাহার কী প্রয়োজন ছিল। নৌকা লইয়া সে একাই সেখানে চলিয়া গিয়াছে।

গণেশের বাড়িটাই পড়ে আগে। সে বাড়িতে ঢুকিল না। অসুস্থ কুবেরের সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

নকুল দাস ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কুবেরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিল, অ কুবির শোন, শুইনা যা।

গণেশ বলিল, কুবির জ্বরে বড়ো কাতর গো।

নকুল বলিল, জ্বর নাকি? তবে যা, বাড়িত্ যা। দ্যাখ গিয়া বাড়িতে কী কাণ্ড হইয়া আছে।

এমন কথা শুনিয়া ব্যাপারটা না জানিয়া যাওয়া চলে না। কুবের উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিল, কীসের কাণ্ড নকুলদা?

শ্যাষ রাইতে তর বউ খালাস হইছে কুবির।

কুবের অবাক হইয়া বলিল, হ? নয় মাস পুইরা যে মাত্র কয়টা দিন গেছে নকুলদা। ইটা হইল কিবা?

ক্যান? নয় মাসে খালাস হয় না?

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ ছাওয়াল হইছে না?

নকুল সায় দিয়া বলিল, হ। আমাগোর পাচী গেছিল, আইসা কয় কি কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্তুর আইছে বাবা, ওই একরত্তি একখান পোলা, তার চাঁদপানা মুখের কথা কী কমু। রং হইছে গোরা।

কুবেরের স্তিমিত চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নকুল শয়তানি হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, তুই তো দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা? ঘরে তো থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।

গণেশ রাগিয়া বলিল, বউ গোরা না নকুলদা?

হ, বউ তো গোরাই, হ?

এর বাড়ির পিছন দিয়া ওর বাড়ির উঠান দিয়া কুবের ও গণেশ এবার একটু জোরে জোরে পা ফেলিয়াই বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। গণেশ ভারী খুশি। বারবার সে বলিতে লাগিল, পোলা হইব কই নাই কুবির? কই নাই ইবার তর পোলা না হইয়া যায় না?

শেষে বিরক্ত হইয়া কুবের বলিল, চুপ যা গণেশ। পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা!

গণেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, তুই নি গোসা করস কুবির?

করুম না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই?

তাহার মেজাজের এই আকস্মিক-উত্তাপ গণেশের কাছে বড়োই দুর্বোধ্য ঠেকিল। অত তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার, হিসাব করিবার ক্ষমতা নাই। বউ থাকিলে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়ে হয় এই পর্যন্ত সে জানে, সুবিধা অসুবিধার কথাটা ভাবিয়া দেখে না। তা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ আসিলে তাহাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব যে মানুষের নয়, যিনি জীব দেন তাঁর, গণেশ এটা বিশ্বাস করে। সুতরাং ছেলে হওয়ার সংবাদে কুবেরের রাগ করিবার কী কারণ আছে সে ভাবিয়া পাইল না। ভাবিবার চেষ্টাও করিল না।

বেড়া দেওয়া ছোটো একটি উঠানের দুদিকে দুখানা ঘর, কুবেরের বাড়ির এর বেশি পরিচয় নাই। এদিকের ঘরের সংকীর্ণ দাওয়ায় একটা ছেঁড়া মাদুর চট প্রভৃতি দিয়া ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় ওটি আঁতুরঘর। কারণ চটের ফাঁক দিয়া ভিতরে শায়িতা মালাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কুবের ওদিকের দাওয়াবিহীন ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার আকাশে কড়া রোদ উঠিলেও জানালা দরজার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় এ ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার। কোনার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈলচিক্কণ কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসি এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়িকলসিতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়িকলসি কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নীচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই। কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বারবার সারাই করিয়া এবং চালানোর সময় ক্রমাগত জল সেঁচিয়া বছর চারেক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিয়াছিল, তারপর একেবারে মেরামত ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ায় ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অন্যদিকে ছোটো একটা ঢেঁকি। ঢেঁকিটা কুবেরের বাবা হারাধন নিজে তৈয়ারি করিয়াছিল। কাঠ সে পাইয়াছিল পদ্মায়। নদীর জলে ভাসিয়া আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রয়োজনে ও-কাঠ নদীতীরে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে? শবের মতো চিতার আগুনের জড়তম সমিধটিরও মানুষের ঘরে স্থান নাই। কিন্তু এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র। কুবের তখন ছোটো, পদ্মানদীর মাঝির ছেলে যতটুকু বয়সে পদ্মায় সাঁতার দিবার মতো পাকা সাঁতারু হইয়া উঠিতে পারে না, তত ছোটো। ছোটো একটি নৌকায় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া হারাধন পদ্মা পার হইতেছিল। নদীর মাঝামাঝি পুরানো নৌকার তলাটা হঠাৎ কী করিয়া ফাঁসিয়া যায়। তখন আশ্বিন মাস, সেখানে পদ্মার এ তীর ও তীরের ব্যবধান তিন মাইলের কম নয়। পদ্মা যাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, পদ্মার বুকে যত ঢেউ থাক, মাইল দেড়েক সাঁতার দিয়া তীরে উঠা তার পক্ষে কষ্টকর কিন্তু অসম্ভব নয়। হারাধন একা হইলে ভাবনা ছিল না। কুবের আর একটু বড়ো এবং শক্তসমর্থ হইলেও সে বিপদে পড়িত না। কিন্তু ছেলেমানুষ কুবের ভয় পাইয়া সাঁতার দিতে চাহে নাই, দিশেহারা হইয়া ক্রমাগত

হারাধনকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন যে লম্বা কাঠের গুঁড়িটি হাতের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিল, হয়তো তাহা চিতা রচনার জন্যই কেহ শ্মশানে আনিয়াছিল। হারাধন কিন্তু কাঠটি ফেলিয়া দিতে পারে নাই, ঘরের আসবাবে পরিণত করিয়া সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছে।

কুবেরের পিসি আর তার বড়ো মেয়ে গোপি কুবেরকে দেখিয়াই চেঁচামেচি করিয়া কাছে আসিয়াছিল। কুবের কারও সঙ্গে কথা বলিল না। লম্বা হইয়া পিসির বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পিসি বলিল, শুলি যে ধন? বউ ওদিকে পোলা বিয়াইয়া সারছে, দেইখা আয়।

গোপি বলিল, বাই উ ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইছে বাবা। নকুইলার মাইয়া পাচী কী কইয়া গেল শুনবা? সায়েবগো এমন হয় না। না পিসি?

কুবের চেঁচাইয়া ধমক দিয়া বলিল, নকুইলা কী লো হারামজাদি? জ্যাঠা কইবার পার না?

গোপি মুখ ভার করিয়া বলিল, ক্যান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?

কী কয়?

রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগোর বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদলা পাঁক দিমুনে ছুঁইড়া মুখের মধ্যে।

দিস, বলিয়া কুবের ঝিমাইতে থাকে। খানিক পরে ও ঘরের দাওয়া হইতে শিশুর জোরালো কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয় ছেলেটা আগেভাগে আসিয়া পড়িলেও গলায় রীতিমতো জোর করিয়া আসিয়াছে। চেচাঁইতে পারে।

২

কয়েকদিন পরে ছিল রথ।

রথ উপলক্ষে কেতুপুরে কোনোরকম ধুমধাম হয় না। পদ্মার ওপারে আছে সোনাখালি গ্রাম, রথের উৎসব হয় সেইখানে। সোনাখালির জমিদারের ছোটো একটি রথ বাহির হয়। সোনাখালি হইতে মোহনপুর অবধি দশ মাইল লম্বা একটি উঁচু পথ আছে। বর্ষাকালে এই পথটিই এ অঞ্চলে জলের নীচে ডুবিয়া যায় না। পথটির নাম ছ-কোশের পথ। নামের মধ্যে পথটির এক ক্রোশ দৈর্ঘ্য কেমন করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে বলা যায় না। সোনাখালির জমিদারদের রথ এই পথ ধরিয়া আধ মাইল খানেক গিয়া অন্নবাবার মাঠের একপাশে থামিয়া থাকে সাতদিন, তারপর উলটারথের দিনে আবার রওনা হয় জমিদারবাড়ির দিকে। স্থানটির অন্নবাবার মাঠ নাম হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া এই মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া দেন। নিজের বলিতে সন্ন্যাসীর এক কানাকড়ি

সম্বলও ছিল না। শোনা যায়, এমনই আশ্চর্য ছিল মানুষের উপর তাঁহার প্রভাব যে সামনে দাঁড়াইয়া চোখে চোখে চাহিয়া তিনি হুকুম দিতেন আর বড়ো বড়ো জমিদার মহাজনেরা মনে মনে চাল ডাল পাঠাইয়া দিত এই মাঠে। শত শত ভদ্র গৃহস্থ নিজেরাই কোমর বাঁধিয়া তাহা রান্না করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের বিতরণ করিত অন্ন। ব্যাপারটা যে ঠিক এইরকমই ঘটিয়াছিল তার কোনো প্রমাণ এখন আর নাই। যেসব বড়ো বড়ো উনানে সেই বিরাট ক্ষুধা-যজ্ঞের আগুন জ্বলিত আজ তাহার একটু কালির দাগ পর্যন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

রথের দিন এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উলটারথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পদ্মা আগে তফাতে ছিল, এখন এত কাছে সরিয়া আসিয়াছে যে মেলার একটা প্রান্ত প্রায় নদীতীরেই আসিয়া ঠেকে। স্থলপথ ও জলপথে দল বাঁধিয়া আসিয়া মানুষ মেলায় ভিড় বাড়ায়। ভিড় বেশি হয় প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের কদিন মেলা একটু ঝিমাইয়া যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্তই মেলায় আমদানি হয়, এমনকি শহরের নারী-পণ্যের আবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। কাপড়ের দোকান, মনোহারি দোকান, মাটির খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, দোকান যে কত বসে তার সংখ্যা নাই। গোরু-ছাগল বিক্রয় হয়, কাঁটাল ও আনারসে মেলার একটা দিক ছাইয়া যায়, বড়ো বড়ো নৌকায় মালদহ ও ত্রিহুতের আম আসে। লেমোনেডের নামে বোতলে ভরা স্যাকারিনের লাল নিস্তেজ জল বিক্রয় হয় অজস্র। মেয়েরা সাধ মিটাইয়া শাঁখা ও কাচের চুড়ি পরে, ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দেয় নূতন ঘুনসি। কয়েকটি স্থানে গবর্নমেন্ট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে। মেলার এটা একটি প্রধান অঙ্গ। সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় বালা খেলার কাছে। চারকোনা বাঁশের বেড়ার চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া চার-চার পয়সায় চার-চার বালা কিনিয়া বেশির ভাগ গরিব চাষাভুষারাই হরদম ছুঁড়িতে থাকে, রুদ্ধনিশ্বাসে চাহিয়া দেখে নিক্ষিপ্ত বালা ক-টি লাল শালুতে সাজানো টাকা আধুলি সিকি ও দোয়ানির অরণ্যে অন্ধের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থির হইতেছে ফাঁকা জায়গায়। পুনরাবর্তিত ব্যর্থতায় তাহাদের কোনোমতে যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। কত কাছাকাছি সাজানো মুদ্রাগুলি, ফাঁকা জায়গাই যে কম! ওদের মধ্যে কে বুঝি বউয়ের জন্য একখানা পাছাপাড় শাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খেলনা ও খাবার এবং সংসারের জন্য কী কী সব জিনিস কিনিতে অনেক দিনের চেষ্টায় জমানো ক-টা টাকা আনিয়াছিল, দ্যাখো, সন্ধ্যার সময় দূরের মানুষ যখন বাড়ির দিকে শ্রান্ত পা বাড়াইয়াছে বেচারির কাছে বিড়ি কিনিবার পয়সাও নাই! আজীবন উপার্জন করিয়া সে পরকে খাওয়াইয়াছে, সে যে কী নিরীহ গৃহস্থ! কারও কথা না ভাবিয়া আজ সে এ কী করিয়া বসিল? একবেলা স্বাধীনভাবে স্বার্থপরতা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে সামলাইতে পারিল না?

রথের দিন সকাল হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামিয়াছিল। বেলা বাড়িলে নিদ্রাতুর চোখ মিটমিট করিতে করিতে গণেশ কুবেরের বাড়ি আসিল।

কুবের তখনও ঘুমাইতেছিল। গণেশ তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। বলিল, চল্ কুবির, না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে।

কুবের প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া বলিল, বয় গণশা, বয়। অ পিসি, আমারে আর গণশারে দুগা মুড়ি দিবা গো? আ লো গোপি, আমারে নি এক ঘটি জল দিবার পারস?

ঘরে মুড়ি ছিল না। কদাচিৎ থাকে। পিসি চারটি চিড়া আর একটু গুড় দিয়া গেল। গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া চিবাইতে চিবাইতে কুবের বলিল, খা গণশা। রথের বাদলা নামছে দেখছস?

হ।

চালায় ছন চাপান লাগে। রাইতের বাদলায় ঘরে জল পড়ছিল, দ্যাখ।

গণেশ চাহিয়া দেখিল, জল পড়িয়া ঘরের একটা কোণ সত্যই ভাসিয়া গিয়াছে। জিহ্বা দিয়া সে একটা আপশোশের শব্দ করিল। বলিল, কোণ দিয়া পড়ছে তাই বাঁচান, না তো জিনিসপত্তর সকল ভাইসা যাইত। চালায় চাপাইবি নাকি ছন আইজ? মেলায় গেলি তো সময় পাবি না?

কুবের মাথা নাড়িয়া বলিল, ছন কই? নাই তো।

ছিল যে ছন?

গোপির মার বিছানায় পাইতা দিছি।

ব্যাপারটা বুঝিয়া গণেশ গম্ভীর মুখে সায় দিয়া বলিল, ভালা করছস। যা বাদলা!

ধীরে ধীরে তাহারা চিড়া চিবাইতে লাগিল। গণেশ যে তাগিদ লইয়া আসিয়াছিল সে যেন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। খাওয়া বন্ধ করিল গণেশ আগে। বাড়ি হইতে সে দুটি পান্তা খাইয়া আসিয়াছে, কুবের খাক। ঘটিটা উঁচু করিয়া মুখে ঢালিয়া সে জল খাইল। আরও দুটি চিড়া মুখে দিয়া বাকিগুলি কুবের দান করিয়া দিল তাহার বড়োছেলেকে। বলিয়া না দিলে চিড়াগুলি সে একাই খাইতে পারে সন্দেহ করিয়া বলিল, চণ্ডীরে দুগা দিস লখ্যা, আঁই?

লখা মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁহুঁক। উয়ারে পিসি দিব।

পিসির আর নাই। দে কইলাম লখ্যা!

কুবেরের দুই ছেলেই উলঙ্গ। বর্ষার ভাপসা গুমোটে ঘামিয়া তাহাদের শীর্ণ দেহ চকচক করিতেছে। পিতৃদত্ত প্রসাদের ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া ঘরের কোণে দুজনের একটা ছোটোখাটো কলহ বাধিয়া গেল। কুবের আর চাহিয়াও দেখিল না। এ যে তাহার ঠিক উদাসীনতা তা বলা যায় না। মনে মনে তাহার একটা অস্পষ্ট উদ্দেশ্যই বুঝি আছে। শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক! দুদিন পরে জীবনযুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন তাহাদের লড়াই বাধিবে তখন মধ্যস্থতা করিতে আসিবে কে?

ঘটিটা তুলিয়া লইয়া ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া কুবের উঠানে কুলকুচা করিল। গণেশের মতো ঘটি উঁচু করিয়া আলগোছে জল খাইয়া কলিকায় তামাক সাজিতে বসিল। পিসি দাওয়ার এক পাশে ইলিশ মাছের তেলে ইলিশ মাছ ভাজিতেছে। অন্য পাশে মালার আঁতুড়। নিচু দাওয়ার মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু ওইখানেই ভিজা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মালা দিবারাত্রি যাপন করিবে। উপায় কী? যে নোংরা মানুষের জন্মলাভের প্রক্রিয়া! বাড়িতে ঘর

থাকিলেও বরং একটা ঘর অপবিত্র করিয়া ফেলা চলিত। দুখানা কুঁড়ে যার সম্বল তার স্ত্রী আর কোথায় সন্তানকে জন্ম দিবে? ভদ্রলোকেরা উঠানে অস্থায়ী টিনের ঘর তুলিয়া দেয়, চৌকির ব্যবস্থা করে। যারা আরও বেশি ভদ্রলোক তাদের থাকে পুরানো খটখটে স্থায়ী আঁতুড়ঘর। কুবেরের তো সে ক্ষমতা নাই। তার যতখানি সাধ্য সে তা করিয়াছে। ভালো করিয়া বেড়া দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আটকাইয়াছে, ঘর ছাইবার শনগুলি বিছানার তলে পাতিয়া দিয়াছে, দেবীগঞ্জের রেল কোম্পানির কয়লা চুরি করিয়া আগুনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর সে কী করিতে পারে?

হঠাৎ এক মিনিটেরও কম সময় ব্যাপিয়া ঝুপঝুপ করিয়া জোরে বৃষ্টি হইয়া গেল। তারপর যেমন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল তেমনি পড়িতে লাগিল। গণেশ দরজার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, যাবি না কুবির?

কুবের বলিল, হ, ল যাই। আইচ্ছা তুই ক দেখি গণেশ, হীরুজ্যাঠার ঠাঁই দুগা ছন চামু নাকি? দিব না?

গণেশ বলিল, হীরুজ্যাঠা ছন দিব? জ্যাঠারে তুই চিনস না কুবির, কাইলের কাণ্ড জানস? বিহানে ঘরে ফির‍্যা শুমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত। খাও আইঠা কলা, ভর রাইত জাইগা ঘুমের লাইগা দুই চক্ষু আঁধার দ্যাহে—চাল বাড়ন্ত! বউরে কইলাম, হীরুজ্যাঠার ঠাঁই দুগা চাল কর্জ আন্‌গা, দুপুরে গাঁয়ে গিয়া কিনা আনুম। কলি না পিত্যয় যাবি কুবির, বউরে জ্যাঠা ফিরাইয়া দিল। কয় কী, বিষ্যুদবার কর্জ দেওন মানা।

কুবের সবিস্ময়ে বলিল, হ? তর নিজের জ্যাঠা না?

নিজের জ্যাঠা বইলাই পিরিত য্যান বেশি কুবির। খালি নিবার পারে, দিবার পারে না।

এই কথাগুলি বলিতে পারার মধ্যে গণেশের পক্ষে বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। কুবের শিরশ্চালনায় সায় দিয়া বলিল, আমার ঘরে পাঠালি না ক্যান বউরে?

গণেশ যেমন বোকা, তেমনি সরল। সে বলিল, তুই চাল পাবি কনে?

একথায় অপমান বোধ করিয়া কুবের উঠিল রাগিয়া।

চাল পামু কনে! ক্যান, আমরা ভাত খাই না? গরিব বইলা দুগা চাল কর্জ না দেওনের মতো গরিব আমি না, জাইনা থুইস!

কুবের রাগে ও গণেশ লজ্জায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে গণেশ আস্তে আস্তে বলিল, গোসা করলানি কুবিরদা?

মাঝে মাঝে, কুবেরের রাগের সময়, ভীরু গণেশ তাহাকে সম্মান করিয়া তুমি সম্বোধন করে।

করুম না! গাও জ্বালাইনা কথা কস যে! আজান খুড়া বইয়া আছে, ল যাই।

কুবের উঠানে নামিয়া গেল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া উঠানটা কাদা ও পিছল হইয়া আছে। গৃহাঙ্গনের এই নোংরা পচা পাঁকের চেয়ে নদীতীরের কাদা অনেক ভালো। সেই কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়া গেলেও যেন এরকম অস্বস্তি বোধ হয় না। বাড়ির পাঁকে পায়ে হাজা হয়, পাঁক ঘাঁটিয়া যাহার জীবিকা অর্জন করিতে হয়, সেই পাঁকের সংস্পর্শে তাহারও

পা কুটকুট করে। আকস্মিক ক্রোধে কুবের ছেলেমানুষের মতো উঠানে একটা লাথি মারিল। পায়ের পাতার একটা পরিষ্কার ছাপ মাত্র উঠানে পড়িল, আর কিছু হইল না।

আঁতুড় হইতে ক্ষীণস্বরে মালা বলিল, আ গো যাইও না, শুইনা যাও। চালা দিয়া নি ঘরে জল পড়ছে? ছনগুলা লইয়া যাও, বিছানার তলে ছন দেওন না দেওন সমান।

মালার মুখে এমন নিঃস্বার্থ উক্তি প্রায় শোনা যায় না। কুবেরের মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তার পরিবর্তে সে বিরক্ত হইয়াই বলিল, কিয়ের সমান! ছন না পাইতা ভিজা ভিতে শোওন যায়? রঙ্গ কইরা কাম নাই, চুপ মাইরা শুইয়া থাক। চালার লাইগা ছন লাগে, আইনা লমু।

হোসেন মিয়া না কইছিল খড় দিব?

হোসেন মিয়া কইলকাতা গেছে।

মালা আপশোশ করিয়া বলিল, কবে গেল? আগে নি একবার কইলা! এক পয়হার সুই আইনবার কইতাম—কইলকাতায় পয়হায় দশখান পাওন যায়।

কলিকাতা হইতে মালা এক পয়সার ছুঁচ আনিতে দিত শুনিয়া কেহ হাসিল না। পিসি বরং মালার কথায় সায় দিয়াই কী যেন বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। জবাব দিবার প্রয়োজন ছিল না। কুবেরের পায়ের আঙুলের ফাঁকে হাজার ঘায়ে বিষাক্ত পাঁক কামড়াইতেছিল। সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

নদীতীরে নৌকায় তাহাদের কাজ ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকা লইয়া তাহারা সোনাখালির মেলায় যাইবে। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা থাকিবে, কেতুপুর ও আশেপাশের গ্রাম হইতে এমন যাত্রীও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে যাহারা ভাড়া দিয়া মেলায় যাইবে। নৌকাটা একটু সাফ করিয়া একটা অস্থায়ী হোগলার ছই খাটাইয়া দেওয়া দরকার। নৌকার ছোটো পালটি মেরামত করিবার জন্য নামানো হইয়াছিল, বাঁশের মাস্তুলে সেটিও আবার ঠিক করিয়া খাটাইতে হইবে। বর্ষাকালে বাতাস প্রায় সোনাখালির দিকেই বহিতে থাকে, গুমোট করিয়া সামান্য বাতাস যদি উঠে, পাল তুলিয়া মেলায় পৌঁছিতে আজ এক ঘন্টা সময়ও লাগিবে না।

নদীর ধারে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিতে পাইল ছাতি মাথায় দিয়া হোসেন মিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘর ছাইবার জন্য হোসেনের কাছে বিনামূল্যে কিছু শণ পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাকে দেখিয়া কুবেরের খুশি হওয়াই উচিত ছিল। তবু লোকটার আবির্ভাবে চিরদিন যে দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কা তাহাকে অস্বস্তি বোধ করায় আজও সেই আশঙ্কাই হঠাৎ তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল। চুপিচুপি বলিল, হোসেন মিয়া রে গণেশ!

তাই তো দেহি!

একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। বাড়ি তাহার নোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বৎসর হইতে কেতুপুরে বাস করিতেছে। বয়স তাহার কত হইয়াছে চেহারা দেখিয়া অনুমান করা যায় না, পাকা চুলে সে কলপ দেয়, নুরে মেহেদি রং লাগায়, কানে আতর মাখানো তুলা গুঁজিয়া রাখে। প্রথম যখন সে কেতুপুরে আসিয়াছিল পরনে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় একঝাঁক রুক্ষ চুল—ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠিত। জেলেপাড়ানিবাসী মুসলমান

মাঝি জহরের বাড়িতে সে আশ্রয় লইয়াছিল, জহরের নৌকায় বইঠা বাহিত। আজ সে তাহার বেঁটে খাটো তৈলচিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢাকিয়া রাখে, নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়। জমি-জায়গা কিনিয়া, ঘরবাড়ি তুলিয়া, পরম সুখেই সে দিন কাটাইতেছে। গত বছর নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে দু-নম্বর স্ত্রীকে। এইসব সুখের ব্যবস্থা সে যে কী উপায়ে করিয়াছে গ্রামের লোক ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য নূতন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে। নৌকা লইয়া হয়তো সে পদ্মায় মাছ ধরিতে গেল—গেল সে সত্যই, কারণ যাওয়াটা সকলেই দেখিতে পাইল, কিন্তু পদ্মার কোনখানে সে মাছ ধরিল, মাছ বিক্রিই বা করিল কোন বন্দরে, কারও তাহা চোখে পড়িল না। তাহার নৌকার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিয়া একটা গল্প মাত্র শোনা গেল যে, যে বন্দরে তাহারা মাছ বিক্রয় করিয়াছে সেখানে নৌকায় যাতায়াত করিতে নাকি সাত-আট দিন সময় লাগে। তারপর কয়েকদিন হয়তো হোসেন গ্রামেই বসিয়া থাকে, একেবারে কিছুই করে না। হঠাৎ একদিন সে উধাও হইয়া যায়। পনেরো দিন এক মাস আর তাহার দেখা মেলে না। আবির্ভাব তাহার ঘটে হঠাৎ.এবং কিছুদিন পরে দুশো গোরু ছাগল চালান হইয়া যায় কলিকাতায়।

বড়ো অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। লালচে রঙের দাড়ির ফাঁকে সবসময়েই সে মিষ্টি করিয়া হাসে। যে শত্রু, যে তাহার ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নির্মমভাবেই দেয় কিন্তু তাহাকে কেহ কোনোদিন রাগ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। মাঝে মাঝে এখনও সে জেলেপাড়ায় যাতায়াত করে, ভাঙা কুটিরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাইয়ে বসিয়া দা কাটা কড়া তামাক টানে। সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এইসব অর্ধ উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালোবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে। না, মনে মনে ইহা বিশ্বাস করে না জেলেপাড়ার কেহই; জীবনযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একেবারে মিলন-সীমান্তে তাহারা বাস করে, মিত্র তাহাদের কেহ নাই। তবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের জন্য কিছু আসিয়া যায় না। হোসেন মিয়া হাসিমুখে একেবারে বাড়ির ভিতরে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া তাহার গোপন, গভীর ও দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিলের আয়োজন আরম্ভ করিলেও জেলেপাড়ায় এমন কেহ নাই যে তাহাকে কিছু বলিতে পারে। বলিতে হয়তো পারে। বলে না শুধু এইজন্যে যে বলা নিরর্থক। তাতে কোনো লাভ হয় না। যা সে ঘটায় সমস্তই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। অন্যথা করিবার জন্য বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইলে কার কী লাভ হইবে? তার চেয়ে বর্ষাকালে ঘরের ফুটা চাল যদি একটু মেরামত হয়, উপবাসের সময় বিনা সুদে যদি কিছু কর্জ মেলে, তাই ঢের লাভ।

হোসেন মিয়ার গোপন মতলবের দুটো একটার খবর যে জেলেপাড়ার লোকেরা রাখে না তা নয়। জেলেপাড়ার তিনটি পরিবার উধাও হইয়া গিয়াছে। হোসেন মিয়া যে ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এক একটি সমগ্র পরিবারকে কোথায় রাখিয়া আসিত প্রথমে

কেহ তাহা টের পায় নাই, পরে জানা গিয়াছিল নোয়াখালির ওদিকে সমুদ্রের মধ্যে ছোটো একটি দ্বীপে প্রজা বসাইয়া সে জমিদারি পত্তন করিতেছে। সে দ্বীপ নাকি গভীর জঙ্গলে আবৃত, শহর নাই, গ্রাম নাই, মানুষের বসতি নাই, শুধু আছে বন্য পশু এবং অসংখ্য পাখি।

কিছু কিছু জঙ্গল সাফ করিয়া এই দ্বীপে হোসেন মিয়া ঋণগ্রস্ত উপবাসখিন্ন পরিবারদের উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। লোভ দেখাইয়া, আশা দিয়া, এক একটি নিরুপায় পরিবারকে সে এই দ্বীপে লইয়া যায়, সৃষ্টির দিন হইতে কখনও আবাদ হয় নাই এমন খানিকটা জমি দেয়, থাকিবার জন্য ঘর দেয়, আবাদের জন্য দেয় হাল বলদ ও জঙ্গল কাটিবার জন্য যন্ত্রপাতি। অন্যান্য স্থান হইতে আরও কতগুলি পরিবারকে সে ওখানে লইয়া গিয়াছে কে জানে, কেতুপুরের জেলেপাড়ার তিন ঘর মাঝিকে সে যে আদিম অসভ্য যুগের চাষায় পরিণত করিয়াছে এ খবর জেলেপাড়ার কারও অজানা নাই। তবু জানা না জানা তাহাদের পক্ষে সমান। মাথা নিচু করিয়া তাহারা হোসেন মিয়ার দেওয়া উপকার গ্রহণ করিবে। মনুষ্যবাসের অযোগ্য সেই দ্বীপকে জনপদে পরিণত করার আহ্বান আসিলে যতদিন পারে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিবে, যেদিন পারিবে না সেদিন স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া, নিঃশব্দে হোসেন মিয়ার নৌকায় গিয়া উঠিবে।

তাই মনে মনে লোকটাকে ভয় করিলেও কাছে গিয়া কুবের বলিল, ছালাম মিয়া বাই।

হোসেন বলিল, ছালাম। কেমন ছিলা মাঝি? কাহিল মালুম হয়?

জ্বরে ভুগলাম। কইলকাতার থনে আলেন কবে?

আইজ আলাম। আর গণেশ বাই, খবর কী? মেলায় যাবা না?

গণেশ ঢোঁক গিলিয়া বলিল, যামু মিয়া বাই, মেলায় যামু। পোলাপানেরা মেলায় যাওনের লেইগা খেইপা আছে, না গেলে চলব ক্যান?

গুমটি দিছে, বাদাম চলব না, সকাল সকাল রওনা দিবা। বদর কইও মাঝি, সাঁঝের আগে ফির্যা আইও, আসমান ভালো দেখি না। শুইনা আলাম আজকালির মদ্যি জবর ঝড় হইবার পারে।

কুবের আকাশের দিকে ও নদীর দিকে চাহিল। পাতলা কুয়াশার মতো মেঘ আকাশ ভরিয়া আছে, নিস্তরঙ্গ পদ্মার বুকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাতে অসংখ্য ছোটো ছোটো বুদবুদ উঠিয়া ফাটিয়া গেলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাইতেছে। নদীর অপর তীর চোখে পড়ে না, নদীর মাঝখানের নৌকা পর্যন্ত অস্পষ্ট। আরও এদিকে একটি স্পষ্টতর নৌকার দিকে চোখ রাখিয়া কুবের সংক্ষেপে প্রশ্ন করিল, যামু না মেলায়? বারণ করেন নাকি মিয়া বাই?

হোসেন বলিল, যাবা না ক্যান? ডর কিসির? আসমান দেইখা রওনা দিবা, আসমান দেইখা ফিরবা। বাদলা দিনের ঝড় জানান দিয়া আহে।

সায় দিয়া কুবের নৌকায় উঠিল। মুসলমান মাঝির দুটি নৌকা ইতিমধ্যেই মেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, দুটি নৌকাই একসঙ্গে ছাড়িয়া গেল। নদীর জল তুলিয়া নৌকা ধুইতে

ধুইতে কুবের একসময় চাহিয়া দেখিল, হোসেন চলিয়া গিয়াছে। চালার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় শণের কথাটা এতক্ষণে তাহার মনে পড়িয়াছে, হোসেনকে বলিয়া রাখিলে ভালো হইত। লোকটা এই আছে, এই নাই! শণের জন্য কাল সকালে হয়তো ওর বাড়ি গিয়া শুনিবে, রাতারাতি ও ঢাকায় পাড়ি দিয়াছে! কবে ফিরিবে? কে তাহা জানে!

হোগলার ছাউনিটা বাতার সঙ্গে বাঁধিতে বাঁধিতে কুবের হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিল, কে হাঁকে রে গণশা?

বহুদূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল, মানব কণ্ঠের একটানা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। দুই কানের পিছনে হাত দিয়া হাঁক শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুবের সাড়া দিয়া উঠিল। এ এক ধরনের ভাষা, পূর্ববঙ্গের মাঝিশ্রেণির লোক ছাড়া এ ভাষা কেহ জানে না। এ ভাষায় কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরে, বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মতো মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে, পদ্মানদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে। শব্দের দুর্লক্ষ্য উৎসের দিকে চাহিয়া সে বুক ভরিয়া বাতাস গ্রহণ করে। বাঁ হাত কানের পিছনে রাখিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে আনিয়া সঞ্চালিত করিয়া উচ্চারিত একটানা আওয়াজে সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

ধনঞ্জয় মন দিয়া শোনে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, কেডা? কী কয়?

কুবের কহিল, আমাগোর রাসু।

ধনঞ্জয় অবাক হইয়া গেল।

বিন্দা মাঝির পোলা? কস কী কুবির! শুনছসনি ঠিক?

রাসুর গলা চিনি না খুড়া? অখনি আইবো, দেইখো।

ধনঞ্জয়ের বিস্ময় কমিতে চায় না। বহুদূরের নৌকাটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, রাসু না হোসেন মিয়ার দ্বীপে গেছিল?

হ।

আইল কিবা?

কুবের বিরক্ত হইয়া কহিল, কিবা কমু খুড়া? আহুক, জিগাইও। হোসেন মিয়া ছাইড়া দিবার পারে, ও নিজে পলাইয়া আইবার পারে, না জিগাইয়া নি কওয়ন যায়?

খানিক পরে আবার হাঁক আসিল, এবার আরও স্পষ্ট। হাঁকের আওয়াজে যে একটি উৎসুক সুর ছিল তিনজনের কানেই তাহা ধরা পড়িল। গণেশ কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া কী বলিতে গিয়া হাঁ করিয়া কিছুই বলিল না। হাঁকের জবাব দিবার জন্য কুবের সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা জীর্ণ পুরাতন নৌকা আসিয়া ভিড়িল পাশে। দুজন অচেনা মাঝি নৌকা বাহিয়া আসিয়াছে। ভিন গাঁয়ের নৌকা। নৌকার খোলটা কাঁটালে এমনভাবেই বোঝাই করা হইয়াছে যে নৌকার প্রান্তভাগ জলের উপর কয়েক ইঞ্চিমাত্র ভাসিয়া আছে। উপরে কোনোরকম আবরণ নাই, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে মাঝি দুজন এবং রাসু তিনজনেই ভিজিয়া

গিয়াছে। তাড়া দিয়া রাসুকে এ নৌকায় নামাইয়া দিয়া মাঝি দুজন বোধ হয় বিড়বিড় করিয়া তাহাকে গাল দিতে দিতেই তৎক্ষণাৎ আবার ঠেলা দিয়া নৌকার মুখ ফিরাইয়া বইঠা ধরিল। পদ্মানদীর চিরন্তন রীতি অনুসারে কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কোন গাঁও থেইকা আইলা মাঝি, যাইবা কোয়ানে?

জবাব দিবার রীতিও চিরন্তন। তাহারা সক্রোধে বলিল, সুলপী থেইকা আইলাম, যামু মেলায়।

রাগের কারণটা তাহাদের সহজেই বোঝা যায়। সুলপী হইতে সোজাসুজি সোনাখালির মেলায় যাওয়ার বদলে রাসুকে এখানে পৌঁছাইয়া দিতে তাহাদের পদ্মা পার হইতে হইয়াছিল। প্রতিদানে রাসু যে তাহাদের কিছুই দিতে পারে নাই তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু এ ক্রোধ তাহাদের ফলপ্রসু নয়—এ শুধু ক্রোধ। রাসুর মতো দুরবস্থায় পড়িয়া আবার যখন কেহ তাহাদের পদ্মা পার করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইবে এমনিভাবে রাগিয়া উঠিলেও সেই নিরুপায় মানুষটিকে তাহারা না বলিতে পারিবে না, বিনা প্রত্যাশায় বোঝাই নৌকা লইয়া তিন ক্রোশ অতিরিক্ত বইঠা বাহিবে। ইহা মহত্ব নয়, পরোপকার নয়—ইহা রীতি, অপরিহার্য নিয়ম। আশ্চর্য এই, এ নিয়ম পালন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠাও অনিয়ম নয়।

নৌকায় পা দিয়া রাসু খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, আমি আলাম গো কুবিরদা।

কন থে আলি রাসু?

কই কুবিরদা, কই। তোমাগো দেইখ্যা মুখে রাও সরে না, কতকাল পরে ফিরা আলাম!

কুবের ও গণেশ তাহার চোখে জল দেখিতে পাইল। ধনঞ্জয় পড়িয়াছিল তাহার পিছনে, সে উপস্থিত থাকিতে রাসু যে আসিয়া পৌঁছিয়াই কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া আহ্লাদে ডগমগ হইয়া উঠিল ইহাতে মনে মনে সে ঈর্ষাতুর ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রাসুর আবির্ভাবে উত্তেজনা তাহারও কম হয় নাই। তাহা গোপন করিয়া শান্ত উদাসভাবে সে বলিল, বয় রে রাসু, বয়।

কুবেরকে ছাড়িয়া রাসু হোগলার নীচে নৌকার আধভেজা পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িল। হাতের উলটা পিঠে চোখ মুছিয়া পরনের জীর্ণ বসনে ঘসিয়া হাতে লাগা অশ্রু পুঁছিয়া ফেলিল। তিন জোড়া চোখ চাহিয়া রহিল তাহার শীর্ণ কঙ্কালসার দেহটির দিকে। তিন বছর আগে হোসেন মিয়ার সঙ্গে সপরিবারে সে যখন ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল দেহ তখন তাহার অবশ্য বিশেষ পরিপুষ্ট ছিল না, কিন্তু এমনভাবে ভাঙিয়াও সে পড়ে নাই। রাসুর মাথায় বড়ো বড়ো চুল জট বাঁধিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, কয়েকটা ঘা এখনও ভালো করিয়া শুকায় নাই। দুটি পা-ই তাহার হাঁটুর কাছ হইতে গোড়ালি পর্যন্ত ফোলা। গায়ের চামড়া যেন তাহার আলগা হইয়া শুকাইয়া শক্ত ও কালো হইয়া উঠিয়াছিল, এখন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজা জুতার চামড়ার মতো স্যাঁতসেঁতে দেখাইতেছে। একটু আগে বহুদূর হইতে অত জোরে হাঁক দিবার শক্তি সে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া কুবের অবাক হইয়া রহিল।

রাসু ঝিমাইয়া পড়িতেছিল, ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল, ময়নাদ্বীপ থেইকা আলি না রাসু?

হ।

পলাইয়া আইছস?

হ, বৈশাখ মাসে।

বৈশাখ মাসে? এতকাল কই ছিলি তুই?

নোয়াখালি ছিলাম। বিষ্যুদবারে আইলাম সুলপী। কমুনে আজান খুড়া, সগগল কমু। অখনে ক্ষুধায় মরি।—অ কুবিরদা, কিছু নি দিবার পার?

তখনকার মতো কৌতূহল নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাসুকে সঙ্গে করিয়া তিনজনে গ্রামে ফিরিয়া গেল। ধনঞ্জয়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই রাসুর আবির্ভাবের বার্তা রাষ্ট্র হইয়া গেল জেলেপাড়ার সর্বত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনঞ্জয়ের উঠান জেলেপাড়ার কৌতূহলী ছেলেমেয়ে স্ত্রী পুরুষে ভরিয়া উঠিল। সকলের চোখে অপার বিস্ময়। তিন বছর আগে সকলে যাহাকে মৃত্যুমুখে সঁপিয়া দিয়াছিল, প্রায় তিন বছর যাহাকে সকলে একরকম ভুলিয়াই ছিল, হঠাৎ সে আবার আসিল কোথা হইতে? রাসুর মামা আশি বছরের বুড়া পীতম মাঝিও ন্যুব্জ দেহ লইয়া লাঠিতে ভর দিয়া আসিয়া পড়িল। রাসু দাওয়ার উপরে চাটাইয়ে বসিয়া মুহ্যমানের মতো একদা-পরিচিত এই জনতার দিকে স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল, কাছে গিয়া ক্ষীণদৃষ্টি পীতম মাঝি তাহাকে অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিল। চিনিতে পারিয়া ভাবাবেগে হাত হইতে লাঠিটা খসিয়া যাওয়ায় হঠাৎ ভাগনের গায়ের উপরেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সে উঠিল কাঁদিয়া। হুমড়ি খাইয়া পড়িবার আঘাতে নয়, কাঁদিয়া উঠিল সে এই বলিয়া যে রাসু একা ফিরিয়া আসিল, আর সকলে কই?

যে অনাহারের পীড়নে রাসু একদিন সপরিবারে ঘরছাড়া হইয়াছিল, দু মুঠা চাল দিয়া পীতম তাহা লাঘব করিবার কোনো চেষ্টাই করে নাই। তাই বলিয়া তার এই কান্না যে অশোভন হইল তা নয়। সেই দুর্দিনে মামার স্বাভাবিক উদাসীনতার স্মৃতি রাসুও মনের মধ্যে পুষিয়া রাখে নাই। শুধু সেই দুর্দিনের স্মৃতি নয়, সবই যেন সে এতক্ষণ ভুলিয়াছিল, তাহার দুঃখ বেদনার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস। পীতমের কান্না শুনিয়া সেও হঠাৎ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল : আমি একা ফির‍্যা আইলাম গো মামা, সবকটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি একা ফির‍্যা আইলাম।

কান্নার মধ্যেও পীতম চমকাইয়া উঠিল। একেবারে বেখাপ্পা সুরে প্রশ্ন করিল, কস কী রাসু, সব কটা গেছে?

রাসু সায় দিয়া বলিল, সব গেছে মামা, আমার কেউ নাই।

কেহ নাই। এক স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা, একুনে এই চারজনকে সঙ্গে লইয়া সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল, হোসেন মিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ ময়নাদ্বীপের উপনিবেশে একে একে চারজনেই মৃত্যুর দেশে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। এই গভীর শোকাবহ সংবাদে কেতুপুরের জেলেপাড়ানিবাসী নরনারী মূক হইয়া গেল। অথচ এই সংবাদ রাসুর আকস্মিক আবির্ভাবের মতোও বিস্ময়কর নয়। সকলেই ইহা জানিত। সমুদ্রের মধ্যে যে দ্বীপে সৃষ্টির দিন হইতে মানুষ বাস করে নাই সেখানে গিয়া কাহারও বাঁচিবার উপায় আছে? রাসুরা

যখন সেখানে যায় তখনই সকলে নিশ্চিত জানিয়াছিল তাহারা মরিতে যাইতেছে। রাসু যে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে আশ্চর্য তো এইটুকুই! এমনই আশ্চর্য যে রাসুকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হইতে চাহে না যে সে সত্যসত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে।

ধনঞ্জয়ের বউ বুতির মা একটি কলাই-করা পাত্রে খানিকটা ঘোল আনিয়া দেয়, রাসু চোখের পলকে এক নিশ্বাসে তা গিলিয়া ফেলে। সমবেত জনতা এতক্ষণ বিশৃঙ্খল হইয়া ছিল, ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে এক একটি সুবিধাজনক স্থান গ্রহণ করিয়া বসিয়া পড়িলে রাসুকে ঘিরিয়া একটি সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ সভার সৃষ্টি হয়। তারপর একে একে উঠিতে থাকে প্রশ্ন। জবাবে রাসুর প্রত্যেকটি কথা সকলে সাগ্রহে গিলিতে থাকে।

প্রীতম শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করে, ময়নাদ্বীপে বাঘ সিঙ্গি আছে না রাসু?

আছে না? বাঘ সিঙ্গিতে বোঝাই!

বলিয়া সকলের মৃদু শিহরণ লক্ষ করিয়া এই অর্ধমৃত অবস্থাতেও গর্বের উত্তেজনা রাসুকে যেন নবজীবন দান করে, ভাঙিয়া পড়িবার ভঙ্গিতে বসিয়া থাকার বদলে হঠাৎ সে হইয়া যায় সিধা! বলে, বাঘ সিঙ্গি! বাঘ সিঙ্গির নামে ডরাইলা? কী নাই ময়নাদ্বীপে কও? সাপ যা আছে এক একটা, আস্তা মাইনসেরে গিলা খায়! রাইতে সুমুন্দুরের কুমির ডাঙায় উঠ্যা আইসা মাইনসেরে টাইনা নিয়া যায়—

হ, বলিতে বলিতে মুখ খুলিয়া যায় রাসুর, আর শুনিতে শুনিতে হাঁ হইয়া যায় তাহার শ্রোতাদের মুখগুলি। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ, এমন ভীষণ স্থান সেটা?

যাহারা রথের মেলায় গিয়াছিল একে একে তাহারা ফিরিয়া আসিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দে। বউরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, নূতন কাচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে। আহ্লাদ বহন করিয়া এই তুচ্ছ উপকরণও যে কুটিরে আসে না, সেখানে যে বিষাদ জমাট বাঁধিয়া থাকে তা নয়, কোনো না কোনো রূপে সোনাখালির মেলার আনন্দের ঢেউ সে কুটিরেও পৌঁছিয়াছে। একটি কাঁটাল, দুটি আনারস, আধসের বাতাসা— এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরা পুঁটির তেলে ভাজা পুঁটিমাছ দিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে—খুশি হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের? কুবেরের প্রতিবেশী বুড়া সিধু দাস একটি পয়সা সম্বল করিয়া মেলায় গিয়াছিল, পয়সাটি সে খরচ করে নাই কিন্তু মেলা হইতে সে যে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে তাহাতে তাহার বৃহৎ পরিবারে আজ উৎসবের অন্ত নাই। ভিক্ষা সিধু করে নাই, বাগাইয়াছে। সারাদিন মেলায় ঘুরিয়া যেন-তেন-প্রকারেন সংগ্রহ করিয়াছে। সংগ্রহ করিয়াছে তিনটি দাগ-ধরা প্রকাণ্ড ফজলি আম, একটা তুলতুলে পাকা আস্ত খাজা কাঁটাল, সের তিনেক একত্র মেশানো চাল ডাল খুদ আর খাসির একটা মাথা। গরিবের উৎসবে আর কী চাই? কুড়ানো ফেলনা জিনিস! খাসির মাথাটা ধরিতে গেলে সে

একরকম চুরিই করিয়াছে বলিতে হয়, কিন্তু তাতে কী? ভিক্ষা সিধু কারও কাছে চায় নাই, পয়সা সিধু কারও চুরি করে নাই।

কুবেরের উঠানে দাঁড়াইয়া সিধু বলে, আমারে না নিয়া ফির্‌‍্যা আলি কুবির?

দাওয়ায় ডিবরির আলোতে কুবের একটা কোঁচের লোহার শলাকাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলে, তুমি না হীরু জ্যাঠার নায় আগেই ফির্‌‍্যা আইলা?

সিধু দাওয়ায় উঠিয়া যায়।

তা আইলাম কুবির, তা আইলাম। রঙ্গ কইরা কইলাম, বোঝস না? কোঁচটা কিনা আনলি সন্দ করি। নিল কত?

অষ্ট আনা।

আট-দশ হাত লম্বা সরু তল্লা বাঁশের ডগায় দশ-বারোটি তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা বসানো মাছমারা যন্ত্রটি সিধুও গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করিয়া দেখে। গোড়ার দিকটা ধরিয়া অন্ধকার উঠানে ছুঁড়িবার অভিনয় করিয়া বলে, ভার মন্দ না, জিতছস কুবির। কাল পরশুতক আমিও একটা কিনা লমু।

সিধুর মতলব কুবের ঠিক বুঝিতে পারে না। কোঁচটি সে ঘরের মধ্যে কোনায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসে। বিকালে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গুমোট করিয়া আছে ; আকাশে বিশেষ মেঘ নাই বটে কিন্তু কখন যে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে বলা যায় না। রাসুকে পীতম তাহার বাড়ি লইয়া গিয়াছে। এখন হয়তো আবার তাকে ঘিরিয়া সভা বসিয়াছে সেখানে, নিজের নির্বাসনের কাহিনি বলিয়া রাসু সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুধা না পাইলে কুবেরও সেখানে গিয়া বসিত। পিসি হঁড়িতে ভাত ফুটাইতেছে, না খাইয়া রাসুর রোমাঞ্চকর গল্পের লোভেও কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা এখন তার নাই।

সিধু বসিয়া বসিয়া বাজে কথা বলে, শিথিল ছাড়া ছাড়া তাহার ভাষা, অনির্দিষ্ট অবান্তর বিষয়বস্তু। কুবের আনমনে সায় দিয়া যায় : হ।

পেটে ক্ষুধার জ্বালা, মনে পীতম মাঝির বাড়ি যাওয়ার তাগিদ, বুড়া সিধুর বকবক শুনিতে শুনিতে বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না।

শেযে সিধু যেন প্রসঙ্গক্রমেই বলে, খাসির একটা মাথা আনলাম কুবির। মস্ত মাথাখান—মইযের মতো দুটা শিং।

নিল কত?

শ্যাষ বেলায় সস্তা কিনলাম কুবির। পুরা পাঁচ আনা চাইয়া শ্যাষ ম্যাশ চোদ্দ পয়হায় দিল। মাইয়াটারে ব্যানুন রাঁইধবার কইলাম, তা কয়, ত্যাল মরিচ নাই, চালও নাকি বাড়ছে।

সিধুর কথা শুনিবার সমস্ত আগ্রহ কুবের সহসা হারাইয়া ফেলে। পিসিকে সে জিজ্ঞাসা করে, ভাত হইল পিসি? একেবারে সে পিছন ফিরিয়া বসে সিধুর দিকে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সিধু উঠিয়া যায়। বাঁশের একট্য টুকরিতে খাসির কোটা মাথাটা আনিয়া কুবেরের সামনে ধরিয়া বলে, দেখ কুবির, মিছা কই নাই। ঘাড়ের কাছে খাসা খানিক মাংস ছিল, এই দেখ—টুকরির কাছে মুখ লইয়া ঠাহর করিয়া করিয়া সিধু কয়েক

টুকরা মাংস বাছিয়া কুবেরকে দেখায়। করুণ নয়নে কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, ত্যাল মরিচ দিয়া ব্যানুন যা হইব—অমর্ত। আমিনুদ্দির ঠাঁই প্যাজ রসুন মাইগা আইনা—

আমারে দেখাও ক্যান? রাঁধগা ব্যানুন।

সিধু এবার স্পষ্ট করিয়াই বলে, ত্যাল মরিচ আর একমুঠা চাল দে কুবির। তরেও দিমুনে ব্যানুন।

কুবের সন্ধিগ্ধ হইয়া বলে, দিবানি নিয্যস?

সিধু আহত হইয়া বলে, দিমু না? কস কী কুবির! তরে না দিয়া যামু কই?

তেল মশলা এবং চাল লইয়া সিধু উঠিল। আঁতুড় হইতে মালা বলিল, বুড়া কী বজ্জাত! মাথার ভাগ দিব না আইঠা কলা দিব, দেইখো। কুবের উদাসভাবে বলিল, না দেয় না দিব। আজ তো শ্যাষ না, আরেক দিন আইলে মাইরা খেদাইয়া দিমু—আমার লগে চালাকি কইরা যাইব কই?

ভাত নামিলে ইলিশ মাছ ভাজা আর লংকা-রক্তিম তরকারি দিয়া ফেনসমেত তপ্ত অন্নে কুবের মুহূর্তের মধ্যে পেট ভরাইয়া ফেলিল। গোপিকে খানিক পরে একটা বাটি লইয়া গিয়া সিধুর কাছ হইতে খাসির মাথার ব্যঞ্জন আনিতে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পীতম মাঝির বাড়ি জেলেপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে। গোয়ালের ভিতর দিয়া তাহার বাড়িতে ঢুকিতে হয় ; গোয়ালের একদিকে বাঁধা থাকে দুটি শীর্ণ গোরু, অন্যদিকে থাকে পীতমের প্রসিদ্ধ বেড়া-জাল, এতবড়ো জাল কেতুপুরের আর কাহারও নাই। বাড়িতে উঠানের বালাই নাই, গোয়াল পার হইয়া ঢুকিতে হয় প্রকাণ্ড একটা ঘরে। দুপাশের ছোটো দুখানা ঘরে ঢুকিবার দরজাও এই ঘরের ভিতর দিয়া। কার্পণ্য ও বেড়া-জালটির মতো বাড়ি করার এই খাপছাড়া ঢংও পীতমের কম প্রসিদ্ধ নয়, লোকে নাম দিয়াছে কয়েদখানা। ঘরের পিছনে খানিকাটা ফাঁকা জায়গা, তারপরে একটা ডোবা। ডোবার ওদিকে বাঁশবনের পরে আর মানুষের বসতি নাই, বহুদূর বিস্তৃত শস্যখেত আষাঢ়ের গোড়াতেই এখন অর্ধেকের বেশি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বাঁশবনে জেলেপাড়ার প্রায় সকলেরই পরিচিত একজোড়া পাঁচ ফুট লম্বা গোখুরা সাপ বাস করে। ডোবায় থাকে কয়েকটি গোসাপ।

বড়ো ঘরখানায় সভা রীতিমতোই বসিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া কুবের অবাক হইয়া দেখিল, সভাপতি রাসু নয়, হোসেন মিয়া। পীতমের কাঠের সিন্দুকটার উপরে কাঁথা ভাঁজ করিয়া পাতিয়া হোসেনকে বসিতে দেওয়া হইয়াছে। রাসু মিশিয়া গিয়াছে একেবারে ভিড়ের মধ্যে। সকলের মুখেই একটা দারুণ অস্বস্তির ভাব, আড়চোখে সকলে হোসেন মিয়ার দিকে চাহিতেছে। এতগুলি লোকের নিশ্বাসে ঘরের আবদ্ধ বাতাস হইয়া উঠিয়াছে দূষিত, গরমে হোসেন মিয়ার কপালে বড়ো বড়ো ফোঁটায় জমিয়া আছে ঘাম। এদিক ওদিক চাহিয়া কুবের টুপ করিয়া সকলের পিছনে বসিয়া পড়িল। হোসেন মিয়া এখানে আসিয়া জুটিল কোথা হইতে? এত লোকের সামনে রাসুর সঙ্গে যখন তাহার মুখোমুখি হইয়া গিয়াছে, কী কাণ্ডটা আজ হয় দ্যাখো!

কুবের বিষাদ বোধ করে। আহা, এতবড়ো একটা কর্মঠ শক্তিশালী লোক, একগুঁয়ে

সম্মানকামী লোক, কপালের ফেরে বড়ো জব্দ হইয়া গেল। রাসু তাহাকে একেবারে হাতেনাতে ধরাইয়া দিয়াছে সকলের কাছে। যে এত প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, আজ বুঝি তার মুখ ফুটিয়া কথা বলিতেও বাধিতেছে। সোজাসুজি অপমান করিবার সাহস হয়তো কাহারও হয় নাই কিন্তু কৌশলে নানাভাবে নানা ইঙ্গিতে কত লজ্জাই লোকটাকে সকলে না জানি এতক্ষণ দিয়াছে। কুবের এমনই মমতা বোধ করে যে সে ভাবিতে থাকে, পারিলে আজ সে হোসেন মিয়ার পক্ষই লইত। লোভ দেখাইয়া মিথ্যা আশ্বাস দিয়া হোসেন মিয়া যে রাসুর স্ত্রীপুত্রকে সুদূর ময়নাদ্বীপে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে, কোন্ যুক্তি দেখাইয়া তাহার এই কীর্তি সে সমর্থন করিত, কুবের তাহা জানে না। সে যাকে ভয় করে, এতলোকের সামনে তার মাথা হেঁট হইয়া যাওয়ায় মনে মনে সে শুধু ব্যথা পাইতেছিল। অন্ধ আবেগের সঙ্গে তার মনে হইতেছিল, যারা পঙ্গু অসহায় জীব, শক্তিকে লজ্জা দেওয়া তাদের পক্ষে ভালো কথা নয়—মানুষের ধর্মবিরুদ্ধ এ কাজ।

একথা কুবের জানে যে হোসেন মিয়ার বিচার করিয়া শাস্তি বিধানের কল্পনা জেলেপাড়ার এই সমবেত মাতব্বরেরা করিবে না! তবু আজ এই সমষ্টি বিচারকের ভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছে। কী স্পষ্টভাবেই না হোসেন মিয়াকে অপমান করিতেছে সকলের বসিবার ভঙ্গি, চাহিবার ভঙ্গি, চুপ করিয়া থাকার ভঙ্গি!

বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কুবের দেখিতে পাইল, জহর আমিনুদ্দি এবং আরও দুজন মুসলমান মাঝি অত্যন্ত গম্ভীরমুখে একদিকে বসিয়া আছে। ধরিতে গেলে এরাই কেতুপুরের মুসলমান মাঝির সমাজ, আরও দু-চারজন যারা আছে তারা একান্ত নগণ্য। এদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় ঘরের বেশি হইবে না। জেলেপাড়ার পূর্বদিকে এদের একত্র সন্নিবেশিত বাড়িগুলিতে বেড়ার বাহুল্য দেখিয়া সহজেই চিনিতে পারা যায়। যতই জীর্ণ হইয়া আসুক, ছেঁড়া চট দিয়া সুপারি গাছের পাতা দিয়া মেরামত করিয়া বেড়াগুলিকে এরা খাড়া করিয়া রাখে। অথচ খুব যে কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা মানিয়া চলে তা বলা যায় না। মেয়েদের বাহিরে না আসিলে চলে না। নদীতে জল আনিতে যাইতে হয়, পুরুষেরা কেহ বাড়ি না থাকিলে দোকানে সওদা আনিতে যাইতে হয়, বাড়ির আনাচেকানাচে লাউ কুমড়া ফলিলে, মুরগিতে ডিম পাড়িলে, গ্রামে গিয়া বেচিয়া আসিতে হয়। বেড়াগুলি পর্দা রাখে শুধু অন্দরের আর এমন বউ-ঝি বাড়িতে যদি কেহ থাকে যাহার বয়স খুব কাঁচা—তাহার। এরা এবং জেলেপাড়ার অ-মুসলমান অধিবাসীরা সদ্ভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড়ো অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য! বিবাদ যদি কখনও বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের যে কারণে বিবাদ হয়, কুবের আমিনুদ্দির বিবাদও হয় সেই কারণেই। খুব খানিকটা গালাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মীমাংসা হইয়া যায়।

মধ্যস্থতা হয়তো করে জহর মাঝিই।

বলে, কুবের বাই ছাড়ান দাও। আরে হোই আমিনুদ্দি, সামাল দে। পোলাপানের পারা কাইজা করস, তগর শরম নাই?

কুবের লক্ষ করিয়া আশ্চর্য হইল, এই আমিনুদ্দি, আজ একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। হোসেন মিয়ার দিকে সে চাহিয়া নাই, সে চাহিয়া দেখিতেছে আমিনুদ্দিকে! আমিনুদ্দির অস্বস্তিও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জহরের মধ্যস্থতায় অনেকবার বিবাদ মিটিলেও মনে মনে আমিনুদ্দির উপর কুবেরের রাগ ছিল। চোখে চোখে মিলিতে সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

কেহ কথা কহে না। কী ভাবিয়া হোসেন মিয়া হঠাৎ কুবেরকেই বিলম্বিত সম্ভাষণ জানাইয়া বসিল।

পিছে বইলা ক্যান কুবের বাই? আগাইয়া বও। খানাপিনা হয় নাই?

কুবের হঠাৎ বড়ো উল্লাস বোধ করিল। আগাইয়া সকলের সামনে গিয়া বসিয়া বলিল, খাইছি মিয়া বাই।

বাঁ হাতে নিজের লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া হোসেন মিয়া বলিল, গণেশরে দেহি না? গেছে কই?

কেডা জানে? ফিরতি বেলায় মেলার মদ্যি মাইজা কর্তা ডাইকা কয়, গাঁয়ে ফেরস নাকি গণেশ?—মাছগুলা বাড়িত্ দিয়া আসিস, লইয়া যা। কইয়া একডালা ইছামাছ দিলেন। মাছ দিবার লাইগা গণশা কর্তাগো বাড়িত্ গেছে সন্দ করি।

মেজোকর্তার নাম অনন্ত তালুকদার। কেতুপুর গ্রামখানি তাহারই। জেলেপাড়ার যাহারা দু-এক বিঘা জমি রাখে, মেজোকর্তাকেই তাহারা খাজনা দিয়া থাকে। মেজোকর্তার নামোল্লেখে সকলে মন দিয়া কুবেরের কথা শুনিল। হোসেন মিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কর্তা আলেন কবে?

আলেন আর বিষ্যুদবারে।

হীরু মাঝি চোখ মিটমিট করিতে করিতে বলিল, মাইজা কর্তার সগল সংবাদ দেহি রাখস কুবের, ভুবন সা-র লগে মামলার কী হইল ক দেহি?

কুবের বলিল, কর্তা হাঁসচরের দখল পাইছেন। ভুবন সা-র নায়েব নাকি কয়েদ হইছে খবর শুনি জ্যাঠা। সাঁইথির কুঞ্জ গোঁসাই সাক্ষী দিছে, স্যায় নাকি নিজের চোখে নায়েবরে কর্তাগো কাছারি ঘরে আগুন দিতি দেখিলো।

পীতম বলিল, হ? তুই জানলি কিবা?

কুবের সগর্বে বলিল, ইডা কী জিগাও মামা? আমার জাননের বাকি কী?

শেতলবাবুর ঠাঁই জানলাম।

শীতলের নামোল্লেখে পীতম মাঝি নিঝুম হইয়া গেল। নকুল শয়তানি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শেতলবাবু? তেনারে পালি কই কুবের?

কুবের হাসিয়া বলিল, নকুলদা য্যান পোলাপান, জান না কিছু। শীতলবাবুর ঠাঁই পয়সা পামু, কাল রাইতে আমাগোর যুগীর বাড়িতে তাগিদ দিবার গেছিলাম। পয়সা দিবার মতলব ডাকাইতটার নাই, খাতির কইরা কইল, বয় রে কুবের, তামুক খা। তামুক টানি রাইজ্যের গল্প কইরা আইলাম। কইলি না পিত্যয় যাবা নকুলদা, শেতলবাবু কয় মাইজাবাবু দেনায় ডুবছে।

বুড়া পীতম মাঝি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, নকুল তখনও শয়তানি করিয়া বলিল, যুগীর না পোলা হইব কুবির?

কুবের বলিল, কেডা জানে? মুটাইছে দেখলাম।

কে জানে, কী আশ্চর্য ইহাদের উপভোগ্য রসিকতা। যুগী পীতম মাঝির মেয়ে, সম্প্রতি জেলেপাড়ারই একধারে একখানা ঘর বাঁধিয়া মেজোকর্তার মুহুরি শীতল ঘোষের সঙ্গে বাস করিতেছে। এত লোকের মাঝে পীতমের সামনেই তাহার মেয়ের সম্বন্ধে নকুল যেমন অনায়াসে রসিকতা করে, সকলে হাসাহাসি করিয়া তাহা উপভোগও করে বিনা বাধায় ও বিনা দ্বিধায়।

পীতম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, বাইর তুই আমার বাড়ির থেইকা নকুইলা, দূর হ!

নকুল মুচকি হাসিয়া বলে, গোসা কর ক্যান মামা! জবাব দিবার পার না মাইঝা কর্তা কুবিররে এত খাতির করে ক্যান—তাই জিগাইয়া? কুবিরের পোলা কেমন ধলা হইছে জিগাও।

কুবের মুষ্টি তুলিয়া বলে, মারুম কইলাম নকুইলা, মাইরা লাশ করুম তরে।

মনে হয়, সভার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। রাসু ও হোসেন মিয়াকে উপলক্ষ করিয়া সভায় যে চাপা অসন্তোষ ও প্রতিবাদের ভাব আসিয়াছিল প্রসঙ্গান্তরে এখন তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে। ও বিষয়ে আর কাহারও কিছু বলিবার বা ভাবিবার নাই। হোসেন মিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

বিয়ানে একবার বাড়িত্ যাইও রাসু বাই। পয়সাকড়ি পাইবা মালুম হয়, নিকাশ নিয়া খারিজ দিমু। ময়নাদ্বীপির জমিন না নিলি জঙ্গল কাটনের মজুরি দিই—খাওন পরন বাদ। কাইল যাইও। লালচে দাড়ির ফাঁকে হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসে, বলে, মন করতিছ, হোসেন মিয়া ঠক। তোমারে ঠকাইয়া হোসেন মিয়ার ফয়দা কিসির! কোন্ হালারে আমি জবরদস্তি ময়নাদ্বীপি নিছি? আপনা খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানবা রাসু বাই। ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কতি পারলা না? একসাথ আইতাম?

রাসু ঘাড় নীচু করিয়া থাকে। আমিনুদ্দি বলে, যান নাকি মিয়া?

হ।

শোনেন। আমি ময়নাদ্বীপি যামু না। কইয়া থুইলাম।

হোসেন মিয়া তেমনি মৃদু মৃদু হাসে।

তোমারে যাতি কই নাই আমিনুদ্দি। খুশ না হলি ক্যান যাবা?

পাতলা পাঞ্জাবি ঘামে ভিজিয়া যাওয়ায় হোসেন মিয়ার বুকের নিবিড় লোমরাজি দেখা যাইতেছিল। সেইখানে হাত দিয়া সে আবার বলিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, এ্যানে আইজ তোমরা ঘা দিলা, এই দিলের মদ্যি। —কুবের বাই, ঘর যাইবা নাকি?

কুবের সায় দিয়া উঠিয়া আসিল। দুজনে গোয়াল পার হইয়া নামিয়া গেল পথে। আকাশ নিবিড় মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে জেলেপাড়ার পথ পায়ের তলেও হইয়া

আছে অদৃশ্য। অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া আগাইতে হয়, দীর্ঘকালের পরিচয় না থাকিলে বাড়ির আনাচকানাচ দিয়া আঁকাবাঁকা পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইত না। কুবেরের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আকাশের জমানো মেঘ হঠাৎ গলিয়া যাওয়ায় চোখের পলকে তাহারা ভিজিয়া উঠিল। কুবেরের সঙ্গে হোসেন মিয়াও উঠিল গিয়া তাহার ভাঙা কুটিরে।

দাওয়ায় ছাট আসিতেছিল, হোসেন মিয়াকে ঘরের মধ্যেই বসিতে দিতে হইল। কুবেরের দুই ছেলে লখা ও চণ্ডী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিয়া ছিল গোপি। চাটাইয়ের উপর জাঁকিয়া বসিয়া হোসেন মিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিল, বলিল, পিয়াস জানায় বিবিজান, পানি দিবা না? গোপি ঘটিতে জল আনিয়া দিলে আলগোছে মুখে ঢালিয়া ঘটিটা দাওয়ার প্রান্তদেশে রাখিল। ঘরের চাল বাহিয়া যে জলের ধারা পড়িতেছিল আঁজলা ভরিয়া সেই জল ধরিয়া ঘটির গায়ে ঢালিয়া ঢালিয়া ঘটিটা গোপি করিয়া লইল শুদ্ধ।

রাত্রি বাড়িতে থাকে, বৃষ্টি ধরিবার লক্ষণ দেখা যায় না। পিসি ঢেঁকি ঘরে গিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়ে, ভাইদের পাশে শুইয়া গোপির দুচোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে, শ্রান্ত কুবেরের চোয়াল ভাঙিয়া হাই উঠে, বাহিরে চলিতে থাকে অবিরাম বর্ষণ। কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইবার পর ঘরের ফুটা কোণ দিয়া ভিতরে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া হোসেন মিয়া আপনা হইতে কাল সকালেই কুবেরের ঘর ছাইবার শণ দিবার কথা বলিয়াছে। কুবের একসময় উঠিয়া গিয়া মালার অবস্থা দেখিয়া আসে। বহু যত্নে কুবের তাহার আঁতুড়ের চারিদিকে বেড়ার সমস্ত ফুটা বন্ধ করিয়াছে, দাওয়ার এদিকটা ভাসিয়া গেলেও আঁতুড়ে বৃষ্টির ছাট ঢুকিবার কোনো পথ নাই। মেঝেটাই শুধু হইয়া আছে ভিজা স্যাঁতসেঁতে যার কোনো প্রতিকার করার সাধ্য কুবেরের নাই। আর কটা দিন পরেই মালা এখান হইতে মুক্তি পাইবে। বুকে পিঠে তাহার যে অল্প অল্প ব্যথা হইয়াছে, কদিন এখানে থাকার ফলে সেটা বাড়িয়া না গেলেই বাঁচা যায়।

মালা ভয়ে ভয়ে বলে, আমারে দুগা মুড়ি চিড়া দিবা গো?

ক্যান, ভাত খাস নাই।

খাইছি। ভাতে টান পড়ল, পেট ভইরা খাই নাই। অখন খিদায় পেট জ্বলে।

জ্বালাইয়া মারস্ বাপু তুই। বলিয়া কুবের হাঁড়ি কলসি খুজিয়া পিসির নিজের জন্য লুকানো কতকগুলি চিড়া মালাকে আনিয়া দেয়। উঠিয়া বসিয়া অন্ধকারে চিড়া মুখে দিয়া মালা বলে, হোসেন মিয়াকে খাইতে দিবা না?

কী দিমু?

মেলার থেইকা আম না আনছিলা? তাই দাও—করবা কী! খিদায় মানুষটা খুন হইয়া যায় না!

কুবেরের সহসা মনে পড়িয়া যায়। ভাবে, সিধুর কাছ হইতে যে মাংসের ব্যঞ্জন পাওয়া গিয়াছে তাই দিয়া আতিথ্য করিলে মন্দ হয় না। মুসলমান মানুষ, মাংস বেশ পছন্দ করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই এ বিষয়ে কুবেরের উৎসাহ কমিয়া যায়। এমন একদিন ছিল হোসেন

মিয়া যখন খাসির মাথার ব্যঞ্জন পাইলে ধন্য হইয়া যাইত, আজ যার তার রান্না ওসব কি আর সে খাইবে? শুধু না খাওয়া নয়, খাইতে বলিলে হয়তো সে আজ অপমানই বোধ করিয়া বসিবে। তার চেয়ে আম যখন আছে, তাই দেওয়া ভালো।

ঘরে গিয়া কুবের একটু অবাক হয়। চাটাইয়ে চিত হইয়া শুইয়া ইতিমধ্যেই হোসেন মিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কুবের সন্তর্পণে মৃদু স্বরে একবার বলে, মিয়া বাই? সাড়া না পাইয়া ঠেলা দিয়া ঘুম ভাঙায় গোপির।

সিধুর ঠাঁই ব্যানুন আনছিলি গোপি?

ঘুমে আধমরা গোপি বলে, উঁহু?

উহুঁ! আনতি কইয়া গেলাম না হারামজাদি?

বাহুমূলে কুবেরের জোর টিপুনিতে গোপি চমকিয়া সজাগ হইয়া বসে। বলে, আনতি গেছিলাম বাবা। দিল না। কইল, বিড়ালে সব খাইয়া গেছে গা।

বিড়ালে খাইয়া গেছে কইল, না?

গোপি সায় দিল ; কুবের রাগে আগুন হইয়া বলিল, হালা জুয়াচ্চোর! র, বিয়ানে খাওয়ামুনে বিড়ালরে। হালা বজ্জাইত।

ছাড়া পাইবামাত্র গোপি ঢলিয়া পড়ে। ঘুম বোধ হয় আসে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই। ঘরের যে কোণে জল পড়িতেছিল কুবের সেখানটা পরীক্ষা করিয়া দেখে। জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য সেখানে সে একটি সরু নালি করিয়া দিয়াছিল, মাটি গলিয়া তাহা প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে। জল জমিয়া ঘরের ভিতরের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে অনেক দূর। হাত দিয়াই নালিটা সাফ করিয়া কুবের জল বাহির করিয়া দেয়। তারপর এক গভীর সমস্যার কথা ভাবিতে লাগে। ডিবরিতে বেশি তেল নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিভিয়া যাইবে। হোসেন মিয়াকে ডাকিয়া তুলিয়া আম খাওয়ার অনুরোধ এখন সে জানাইবে কি? বাদলা নামিয়া ঠান্ডা পড়িয়াছে। লোকটা আরামে গভীরভাবে ঘুমাইতেছে। ডাকিলে চটিবে না তো?

ঘুমের মধ্যে হোসেন মিয়া পাশ ফিরিল। দ্যাখো, হঠাৎ কুবের কী আবিষ্কার করিয়াছে। হোসেন মিয়ার লম্বা পাঞ্জাবির পকেট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে আনকোরা নতুন একটা টাকাপয়সা রাখিবার ব্যাগ! ব্যাগটা সে আজই মেলায় কিনিয়াছে সন্দেহ নাই। শখ করিয়া নতুন ব্যাগে কত টাকাপয়সা হোসেন মিয়া রাখিয়াছে কে জানে, ব্যাগটা ফুলিয়া মোটা হইয়া গিয়াছে।

কুবেরের দেহে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। একমুঠা টাকা ও রেজকি হইতে প্রথমে সে একটা আধুলি ছাড়া আর কিছু লইতে সাহস পায় না। তারপর সে ভাবিয়া দেখে যে এতগুলি খুচরা রেজকি কি আর হোসেন মিয়া হিসাব করিয়া গুনিয়া গাঁথিয়া রাখিয়াছে? আরও একটা সিকি এবং একটা আনি সে বাহির করিয়া লয়।

ব্যাগটা হোসেন মিয়ার লম্বা পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকাইয়া ফুঁ দিয়া সে ডিবরিটা নিবাইয়া দেয়। তখন একটা বড়ো ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া যায়।

গোপি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে, বাবা!

কুবেরের দেহ শিরশির করে, মেরুদণ্ডটার ঠিক মাঝামাঝি।

চুপ যা গোপি, ঘুম যা।

আমারে কাইল পয়সা দিবা?

দিমু—চুপ যা, ঘুম যা গোপি।

গোপি আর কথা বলে না। অন্ধকারে দুহাত লম্বা ছোটো চাটাইটি সন্তর্পণে বিছাইয়া কুবের শুইয়া পড়ে।

৩

ভোরে আগে ঘুম ভাঙিল হোসেনের। কুবেরকে সে-ই ডাকিয়া তুলিল, চোখ মেলিয়াই কুবেরের কেন যেন হঠাৎ এক অকারণ ত্রাসে মন ভরিয়া গেল! কী হইয়াছে? বিপদ কিসের? হ, কাল রাত্রে সে হোসেন মিয়ার পয়সা চুরি করিয়াছিল। একদফা চোখ মিটমিট করিয়া কুবের আশ্বস্ত হইল। হোসেন মিয়াকে খাতির করিয়া বলিল, যান নাকি মিয়া বাই? খিদায় কাতর হইছেন সন্দ করি—রাইতে কিছু খান তো নাই। এক কাম করেন, দুইগোটা আম খাইয়া যান।

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙা মুখেও হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে পারে।

খাওনের কথা থোও কুবির বাই। বাড়িত্ গিয়া খামু।

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বিড়ি ধরাইয়া হোসেন উঠিল। ঘুমন্ত গোপির দিকে এক নজর চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাইয়ার বয়স কত, কুবির বাই?

নয় সন্দ কইরা থুইছি।

বিয়া দিবা না মাইয়ার?

হ। দিমু, কেরমে কেরমে দিমু।

পকেট হইতে হোসেন ব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিল। দেখিয়া পাংশু হইয়া গেল কুবেরের মুখ। কিন্তু না, টাকাপয়সা গুনিয়া দেখিবার জন্য হোসেন ব্যাগ বাহির করে নাই। একটা সিকি বাছিয়া লইয়া সে কুবেরের হাতে দিল, বলিল, বাচ্চাগো খাবার কিনা দিও কুবির বাই। বলিয়া ব্যাগটা আবার পকেটে রাখিয়া দিল। কুবের আত্মসম্বরণ করিল তৎক্ষণাৎ। যে বিপদ ঘটিল না তার জন্য আর কেন বুক কাঁপিবে, মুখ শুকনো দেখাইবে? খুশিতে বেসামাল হইয়া সে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিল, ব্যাগটা নতুন দেখি? মেলায় কিনছেন বুঝি কাইল?

হোসেন বলিল, হ।

কথা কহিতে কহিতে দুজনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন বৃষ্টি নাই কিন্তু মেঘে মেঘে প্রভাতের রূপ অস্বাভাবিক থমথমে। হোসেন একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী! ভিজিয়া চুপসিয়া চারিদিক সকাতর হইয়া আছে। হোসেনের মনের কোণে একটু স্বাভাবিক কবিত্ব ছিল, জীবনে

ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে হয়তো সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত, তার মধ্যে দুটি-একটি মুখে মুখে প্রচার হইয়া স্থান পাইত শতাব্দীর সঞ্চিত গ্রাম্যগীতিকার অমর অলিখিত কাব্যে— মাঠেঘাটে, মশালের আলোয় আলোকিত উঠানে গীত হইয়া হইয়া ভণিতায় হোসেনের নাম দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িত, লোকে বলিত হোসেন ফকির, চল কেতুপুরে দেওয়ান ফকির হোসেন ছাহাবের দরগায় চেরাগ জ্বালি। হোসেন বুঝি কুবেরকে একেবারে ভুলিয়া যায়। অনেকদিন আগে, কুবেরের মতো ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আধপেটা খাইয়া জলে কাদায় সে যখন দিন কাটাইত, সকাল সন্ধ্যায় তখন মনে তাহার ভাসিয়া আসিত গানের চরণ। ফুটা চালার নীচে ময়লা চাটাইয়ের বিছানায় উদরে উপবাস লইয়া তেমনিভাবে কাল রাতটা কাটাইয়া আজ আবার হোসেনের মনে গান ভাসিয়া আসিতেছে।

কুবের, গাহান বাইন্ধবার পার?

আমি পারতাম না। আমাগোর যুগইলা পারে। মুখে মুখে ছড়া বাইন্ধ্যা দেয়।

আমি বাইন্ধবার পারি।

কন কী মিয়া বাই?

হোসেন এখন লাজুক। সে এদিক ওদিক তাকায়। ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাইয়া কুবেরের কাছেই অপরাধীর মতো হাসে। লোকটার আদি-অন্ত পাওয়া ভার।

তারপর হোসেন বলে, বাঁধুম, শুনবা?

কুবের বলে, কন মিয়া বাই, কন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হোসেন সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করে :

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু, কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া, কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রুপার কুপি,
উঠ্যা দেখবা না।
আলা করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি,
দিশা রাখবা না।
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ-নাও
দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও?
জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ্ ভাঙ্গে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
মাঝি কত ঘুমাইবা।

কুবের অভিভূত হইয়া বলিল, মুখে মুখে বানাইলেন মিয়া বাই?

খুশ হলি না পারি কী? হোসেন মিয়া আর দাঁড়াইল না। দুপুরবেলা ঘরের চালের জন্য

শণ আনিতে গিয়া কুবের শুনিল, সে বিদেশ গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। কিন্তু হোসেন মিয়ার কথা কখনও বেঠিক হয় না। কুবেরের জন্য শণ সে রাখিয়া গিয়াছে।

গোপির বয়স এগারো, কুবের মেয়ের বয়স এক বছর ভাঁড়ায় আর এক বছর হাতে রাখিয়া বলে, নয়। ন বছর বয়সে যে মেয়ের এগারো বছরের বাড়, বিয়ের বাজারে তার দাম আছে। গণেশের শালা যুগল সম্প্রতি পাশের গ্রাম হইতে বোনের তত্ত্ব লইবার ছলে আসা যাওয়া শুরু করিয়াছে। সোজাসুজি কথা সে এখনও পাড়ে নাই, আলাপ আলোচনার মাঝখানে বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করিয়া কুবের কী রকম দর হাঁকিবে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্পষ্ট করিয়া কুবেরও এখন পর্যন্ত কিছু বলে নাই। কথা উঠিলে বহুক্ষণ ধরিয়া মেয়ের প্রশংসা কীর্তন করিয়া শুধু একটু আভাস দিয়াছে দুকুড়ি তিনকুড়ি টাকার। বুদ্ধি থাকে যুগল আন্দাজ করিয়া নিক। গণেশের আত্মীয় বলিয়া টাকার বিষয়ে কুবের তাহাকে খাতির করিবে না। যুগল সম্ভবত তাহা টের পাইয়াছে, তাই ইলিশ মাছের মরশুমটা শেষ হইবার প্রতীক্ষায় আছে। হাতে তখন কী রকম টাকা জমে দেখিয়া কথা পাড়িবে। কুবের বোঝে না কী! সকলের গোপন মতলব সে চোখের পলকে আঁচ করিয়া ফেলে।

মানুষ মন্দ নয় যুগল। এতকাল অবস্থা খুব খারাপ ছিল, তাই বত্রিশ বছর বয়স অবধি বিবাহ করিতে পারে নাই ; নিজের চেষ্টায় এখন সে অবস্থা ভালো করিয়াছে। উন্নতির জন্য তাহার প্রশংসনীয় প্রয়াসের কথা কাহারও অবিদিত নয়। দুটি একটি করিয়া কতকাল ধরিয়া কত কষ্টে সে কিছু টাকা জমাইয়াছিল, তারপর গণেশের কাছে বোনের বিবাহ দিয়া পাইয়াছিল তেইশ টাকা! সকলে ভাবিয়াছিল, এবার যুগল বিবাহ করিবে, বিবাহের জন্য ছাড়া অত কষ্টে টাকা জমায় কে? কিন্তু যুগল তা করে নাই। সমস্ত জমানো টাকা দিয়া একটা বড়ো নৌকা কিনিয়া সকলকে সে অবাক করিয়া দিয়াছিল। দুশো টাকা সে নৌকার দাম, সুতরাং টাকা সে কম জমায় নাই। ইচ্ছা করিলে ওই টাকায় সে তিন-তিনটা বিবাহ করিতে পারিত। অন্তত একটা বিবাহ করিয়া বাকি টাকায় একটা ছোটোখাটো নৌকা কিনিতে কোনো বাধাই ছিল না। তার বদলে উপার্জনের এই স্থায়ী উপায়ের জন্য সমস্ত পুঁজি ভাঙিয়া সে যে সুবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল তার তারিফ করিতেই হয়। দ্যাখো, এক বছরে যুগলের ভাঙা ঘর নূতন হইয়াছে, শীর্ণ দেহে মাংস লাগিয়াছে, বিবাহের জন্য টাকাও সে আবার জমাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে কিনা কে জানে! জাহাজঘাটে অত বড়ো নৌকার না চাহিতে ভাড়া হয়। রেলে ও জাহাজঘাটে আসিয়া কত মানুষ ও মাল কত গ্রামে যায়, এক একটি বাণিজ্য দ্রব্যের মরসুমের সময় কত মহাজন গ্রামে গ্রামে দাদন দেওয়া মাল সংগ্রহের জন্য চড়া দরে অসংখ্য নৌকা ভাড়া নেয়। আর শুধু ভাড়া তো নয়। উপরি আয়ও কী কম! ধানের বোঝাই লইয়া একদিনের পথ পাড়ি দিবার সময় দশ-বিশ সের ধান নৌকার গোপন ফাঁকে ফোকরে লুকাইয়া ফেলিবার সুযোগ মেলে ঢের। কেবল ধান নয়, কলাই, মটর, হলুদ, লংকা প্রভৃতি কত কী জিনিস বছর ভরিয়া যুগল অমন কত আনিয়াছে। উন্নতি সে আরও করিবে। কারণ, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো বিষয়ে তাহার এতটুকু শিথিলতা

আসে নাই। এখনও সে আগের মতোই কৃপণ। আকুরটাকুরের মাঝিসমাজে আজ সে একজন মাতব্বর লোক। একদিন সে-ই যে গ্রামের মোড়ল হইয়া দাঁড়াইবে কেহ তাহাতে সন্দেহ করে না।

মালার ইচ্ছা বিবাহটা তাড়াতাড়ি চুকিয়া যায় গোপির। এত বয়স হইল আর কতকাল বয়স ভাঁড়াইয়া মেয়েকে কুবের ঘরে রাখিবে? লোকে যে ইতিমধ্যেই নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্বামীকে মালা তাগিদ দিয়া বলে, আগো, যুগইলা নি কিছু কয়? কুবের তাহাকে চোখ ঠারিয়া বলে, কয় না?

কী কয়?

তা শুইনা তর কাম কী? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস—রাও করস কে রে?

মালা রাগে বইকি!

গাও জ্বালাইনা কথা দেহি খইর পারা ফোটে, মায় নি মুখে মধু দিছিল আঁতুড়ে?

গোসা-হইলে মারুম গোপির মা।

মারবা নাকি? আগো মার, মার—না যদি মার লখার মাথা খাইবা।

কুবের ঝিমাইতে ঝিমাইতে নিদ্রাকাতর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। হ, ছেলে কোলে রোগা বউটিকে তাহার রাজরানির মতো দেখাইতেছে বটে। কে জানে রাজরানি দেখিতে কেমন? ছেলেটাও যেন ফরসাই হইয়াছে মনে হয়, এমনি বয়সে লখা আর চণ্ডী যেমন তামাটে লাল রংঙের ছিল সেরকম নয়। আঁতুড়ে যতদিন ছিল কুবের বিশ্বাস করে নাই, এখন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়াছে যে ছেলেটা সত্যসত্যই খুব ফরসা হইবে। মালার রং কালো নয়, তামাটে—মাঝে মাঝে তাহাকে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো ফরসাই দেখিয়া বসে। জেলেপাড়ার কোনও স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নাই। একটা পা যদি ওর হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধূলা ঝাড়িতেও আসিত না। কিন্তু মালার চেয়েও ছেলেটার রং যেন ঢের বেশি ফরসা হইয়াছে। আরও কিছু বড়ো হইলে বিবর্ণ হইয়া আসিয়া শেষ পর্যন্ত রং হয়তো ওর মালার মতোই দাঁড়াইবে। তাই যেন দাঁড়ায়। কুবের তাই চায়। যতই সে শান্ত ও সুবিবেচক হোক, মাঝে মাঝে লোকের বিশ্রী ইঙ্গিতে গা জ্বালা করে বইকী, মালার দিকে চাহিয়া কখনও কখনও মনে ঘনাইয়া আসে বইকী একটা বিতৃষ্ণা মেশানো ব্যথিত ক্রোধ। কুবেরের দৃষ্টি আরও ঘোলাটে হইয়া আসে। এখন, শ্রাবণের এই প্রথম সপ্তাহে আকাশে মেঘের এক মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। পরপর কয় রাত্রি অবিরত জলে ভিজিয়া কুবের আবার জ্বর বোধ করিতেছে।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গিয়াছে, তবু থামিয়া যাওয়া আলোচনাটা আবার আরম্ভ করিতে কোনোরকম ভূমিকার দরকার হয় না। এইমাত্র রাগারাগি হইয়া গিয়াছে? কে বলিল! কত শান্ত ও মোলায়েম কুবেরের গলার স্বর।

স্পষ্ট কইরা যুগল কিছু কয় না গোপির মা।

মালার গলাতেও এতটুকু ঝাঁঝ নাই।

কয় না? ক্যান? গোপিরে নিব না?

গণশা কয় নিব, যুগইলা কিছু কয় না। উদিন আমারে জিগায় খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়।

তুমি কী কইলা?

আমি কইলাম, তুই বলদ যুগইলা, খোঁড়া নি ব্যারাম যে মার থাকলি মাইয়া পাইবো? আমাগোর গোপির চলন পরীর পারা। জানো নি গোপির মা, গণশা মোরে এক বিষম বিত্তান্ত কয়। নকুইলা গিয়া গিয়া যুগইলার নাকি মন ভাঙে, বাকা বাকা মাইয়ার খবর দিয়া আহে। যুগইলা য্যান দুই-দশটা মাইয়ার খবর না নিয়া গোপিরে নিব না সন্দ করি গোপির মা!

বলিয়া কুবের যেন ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু মালা তাহাকে চেনে। সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

জানো নি গোপির মা আরেক বিত্তান্ত? রাসু গোপিরে নিব কয়।

মালা বিস্মিত হয় না। শুধু বলে, চালচুলা নাই।

সায় দিয়া কুবের-বোধ হয় এবার সত্যই ঘুমাইয়া পড়ে। কারণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও মালা আর তাহার কোনো মন্তব্য শুনিতে পায় না। বসিয়া বসিয়া ছেলেকে সে স্তন দেয়। রোয়াকের ওদিকে রান্নার জায়গায় বসিয়া পিসি গোপির মাথার উকুন বাছিতেছে, সারারাত উকুনের কামড়ে মেয়েটা মাথা চুলকাইয়া সারা হয়। লখা ও চণ্ডী হয় ডাংগুলি খেলিতে গিয়াছে, আর না হয় কোথাও বঁড়শি ফেলিয়া ধরিতেছে পুঁটিমাছ। যেখানেই ওরা থাক আর যাই করুক, জলে ভিজিয়া জ্বরে পড়িবে না, জলে ডুবিয়া মরিবেও না। সে ভয় মালার নাই। সে কেবল ভাবিয়া মরে, মারামারি করিয়া ছেলে দুটা কোনোদিন না খুন হইয়া আসে। পঙ্গু বলিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে মালার পরিচয় কম। কেতুপুরের দশমাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামের এমনই এক ভাঙা কুটিরে তার মায়ের এক বামুন ঠাকুরের নামে কানাকানি-করা পাপের প্রমাণস্বরূপ এই ভাঙা পা-টি লইয়া সে জন্মিয়াছিল, বড়ো হইয়াছিল বাড়ির মধ্যে লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। বাড়ির অদূরে রাম গোয়ালার গোয়ালঘরের কাছে কদম গাছটি পর্যন্ত ছিল তাহার কষ্টকর গতিবিধির সীমা। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ওই কদম গাছটির তলে খেলা করিত, আর করিত মারামারি। বড়ো ছেলেরা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলিকে মারিয়া আর কিছু রাখিত না। অনেক সময় এইসব মারামারির শেষ ফলটা গড়াইত বয়স্কদের মধ্যে, পাড়ায় মহামারি কাণ্ড বাধিয়া যাইত। দূরে দাঁড়াইয়া চোখ বড়ো বড়ো করিয়া মালা মজা দেখিত, বড়ো ভয় করিত তাহার। অন্য ছেলে মার খাইলে সে কিছুই করিত না, কিন্তু যেদিন সকলে মিলিয়া তাহার ছোটো ভাই দুটিকে পিটাইতে আরম্ভ করিত সেদিন সে খুলিত মুখ—তাহার বাঁশির মতো সরু গলা শোনা যাইত পাড়ার সর্বত্র, সকলে ছুটিয়া আসিত। তার আগেই মালাকে কিন্তু দিতে হইত ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্য। ভাইয়ের বদলে ছেঁচা খাইত সে। একজন একটা ধাক্কা দিলেই সে মাটিতে পড়িয়া যাইত। তখন চার-পাঁচজন মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তুলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিত রাম গোয়ালার গোয়ালঘরের পিছনে গোবরগাদায়।

সেই হইতে ছেলেদের মারামারিকে বড়ো ভয় করে মালা। নিজের ছেলে দুটিকে সে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু খাতির তাহাকে কেহ করে না। বসিয়া বসিয়া যাহার দিন কাটে কে তাহার মুখ চাহিবে, কথা শুনিবে? হাজার বারণ করুক মালা, লখা ও চণ্ডী চোখের পলকে উধাও হইয়া যায়। ফাঁকি দিয়া কাছে ডাকিয়া জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে গেলে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া একেবারে রক্তপাত করিয়া ছাড়ে। তবু প্রতিদিন মালা তাহাদের নানা ছলে কাছে রাখিবার চেষ্টার কামাই দেয় না। সন্তানস্নেহের হিসাবে জেলেপাড়ার জননীদের মধ্যে মালার মৌলিকতা আছে। ছেলের বয়স আট-দশ বছর পার হইয়া গেলে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা জেলেপাড়ার মেয়েদের রীতি নয়। চিন্তা করিবার অপরাপর বিষয়ের তাদের অভাব নাই। কচি ছেলে ছাড়া মায়ের কোল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিষ্ঠুর ছাড়া স্বামীও বড়ো একটা হয় না। দুটি কুঁড়েঘরের কুটিরে যে সংকীর্ণ সংসার, তারও কাজ থাকে অফুরন্ত। পুরুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকারি কেনাবেচা করে, চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ যোগান দেওয়া তাদের কাজ নয়। ও কাজটা জেলেপাড়ার মেয়েরা সন্তান প্রসবের আগে-পিছে দু-একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া করিয়া যায়। অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কোনো সন্তানের ছোটো ছোটো বিপদ-আপদের কথা ভাবিবারও যেমন তাহাদের সময় নাই, ওদের স্নেহ করিবার মতো মানসিক কোমলতাও নাই। নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা। ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়াকান্না কাঁদে। মালা পঙ্গু, অলস। ঘরের কোনায় সে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে, জেলেপাড়ার রূঢ় বাস্তবতা তাই তাকে অনেকটা রেহাই দিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলিকে ভালোবাসিবার মতো মনও তাহার আছে, সময়ও সে পায়।

ছেলেদের সে ফিরিয়া পায় সন্ধ্যার পর। সারাদিন পরে পাখির ছানার মতো অবসন্ন ছেলে দুটি ফিরিয়া আসে ঘরের কোনায়, খোঁড়া মাকে তখন তাদের প্রয়োজন হয়। জেলেপাড়ার প্রত্যেকটি কুটিরে যে অভিনয় অজানা, প্রতি দিনান্তে কুবেরের ঘরে তাহার অভিনয় হয়। বাহিরে সবটুকু শয়তানি অপচয় করিয়া লখা ও চণ্ডী শান্ত হইয়া থাকে, ভদ্র ও বাধ্য ছেলের মতো ঘেঁষিয়া আসে মায়ের কাছে। সারাদিন মালার যে একতরফা অবহেলিত স্নেহ খাপছাড়া লাগিতেছিল, অপর পক্ষ গ্রহণ করামাত্র তাহা মধুর ও অপূর্ব হইয়া উঠে। মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, এক ছেলের মুখে স্তন গুঁজিয়া রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর শখ মালার একার নয়, এমনিভাবে খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না। আর হ, মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই এ সময়টা সে যে কত বড়ো নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। লখা ও চণ্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা ভিজা গায়ের চামড়া। ডিবরির শিখাটি ঊর্ধ্বগ ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরে চাল পচা শণের, চারিপাশের দেয়াল চেরা বাঁশের, স্যাঁতসেঁতে ঢেউ তোলা মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার।

ইলিশের মরসুমে কুবের এসময় বাড়ি থাকে কদাচিৎ। যেদিন থাকে সেদিন বড়োলোকের বাড়ির পোষা কুকুরের মতো উদাস চোখে এসব সে চাহিয়া দেখে, স্নেহমমতার এইসব খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা। দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়োলোকের পোষা কুকুরের মতোই চাটাইয়ে একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে, মুখখানা করিয়া রাখে গম্ভীর। লখা ও চণ্ডীর মতো মন দিয়া সেও যে রূপকথা শুনিতেছে মালার তাহা টের পাইতে বাকি থাকে না। ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও সে তাই থামে না, হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া রস দিয়া ঘুমন্ত ছেলেদের গল্প বলিতে থাকে। গল্প বলিতে সে ওস্তাদ। একই গল্প বারবার বলিয়া শ্রোতাদের সে সমান মুগ্ধ করিতে পারে। গোপি সরিতে সরিতে মার গা ঘেঁষিয়া আসে। পিসি ঠায় বসিয়া থাকে দুয়ারের কাছে। মালার গল্প শুনিতে আরও কে কে আসিয়া পড়িয়াছে দ্যাখো। গণেশের বউ উলুপী, ছেলে মনাই আর মেয়ে কুকী। আর আসিয়াছে সিধুর তোতলা হাবা মেয়ে বগলী। কথা বলিয়া কেহ মালার রূপকথা বলায় বাধা দেয় না, চুপচাপ শুনিয়া যায়। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে মালাই সকলের সঙ্গে আলাপ করে।

আ লো উলুপী, পাক করছিলি কী?

আখায় দুগা বাইগন দিছিলাম। আর ইলশার ঝোল।

কুকী! গায় কাপড় তুইলা বয় হারামজাদি! মাইয়া য্যান সং।

বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া কুবেরকে লজ্জা দিয়া মালা আবার রূপকথা বলিতে থাকে।

৪

এবারে বর্ষায় আউশ ধানের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

পীতম মাঝির বাড়ির পিছনে তেঁতুলগাছটার গুঁড়ি পর্যন্ত কোনোবার জল আসে না, এবার আউশ ধান পাকিবার সময় হঠাৎ এত জল বাড়িয়া গেল যে গাছের গুঁড়িটা সপ্তাহকাল ডুবিয়া রহিল প্রায় তিন হাত জলের নীচে। এ জল আগে বাড়িলে ক্ষতি ছিল না, জলের সঙ্গে ধানের গাছও বাড়িয়া চলিত। কিন্তু ফসল পাকিবার সময় জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ধানগাছ কেমন করিয়া বাড়িবে?

বড়ো বর্ষা হইয়াছিল এবার। কেতুপুরের মাইল পাঁচেক দূরে চন্নার চর নামে পদ্মার একটা নিচু চর অর্ধেক জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, অনেকে ভয় পাইয়া চলিয়া গিয়াছিল চর ছাড়িয়া। বহুকাল আগে খেয়ালি পদ্মা যে ভূমিখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল কে জানে সহসা সে আবার তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে কিনা! ডাঙার গ্রামে বর্ষার জল ঘরে উঠিলেও পূর্ববঙ্গের লোক ভয় পায় না, সে জলের স্রোত নাই। কিন্তু পদ্মার বুকে ছোটোখাটো চরে যেসব গ্রাম, পদ্মার জল নাগাল পাইলে সেসব গ্রামের ঘর বাড়ি গোরু মানুষ কুটার মতো ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

কত গ্রাম যে এবার পাঁচ-সাত দি া জলের নীচে ডুবিয়া ছিল।

মালার বাপের বাড়ির গ্রাম চরডাঙা নাকি তলাইয়া গিয়াছিল এক কোমর জলের নীচে।

খবর পাইয়া মালা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। বলিয়াছিল, আই গো তোমার পাষাণ প্রাণ! আমার বাপ ভাই ডুইবা মরে, একবার নি খবর নিলা!

গণেশকে সঙ্গে করিয়া কুবের একদিন খবর আনিতে গেল।

খাল পুকুর মাঠ ঘাট তখন একাকার হইয়া গিয়াছে। দুমাস আগে যে খেতের আল দিয়া মানুষ চলাচল করিত, এখন সেখানে লগি থই পায় না। কোনো গ্রাম ভাসিয়া আছে দ্বীপের মতো, কোনো গ্রামে মানুষের ঘরের ভিতরে একহাঁটু জল উঠিয়াছে, সকলে বাস করিতেছে মাচা বাঁধিয়া। যে পারিয়াছে গোরু বাছুরের জন্যও মাচা বাঁধিয়া দিয়াছে, যে পারে নাই তার বোবা অসহায় পশুগুলি ঠায় দাঁড়াইয়া আছে জলের মধ্যে। গাছের ডালে পাখিরা শুধু আছে সুখে, ভূচর মানুষ ও পশুর কষ্ট অবর্ণনীয়। এক বাড়িতে কান্না শুনিয়া কুবের উঠানে নৌকা লইয়া গেল, দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল বাঁশের খুঁটির উপর দুখানা তক্তপোশ একত্র করিয়া জিনিসপত্র-সহ গৃহস্থ সপরিবারে বাস করিতেছে, মাসখানেকের একটি শিশুকে বুকে করিয়া গৃহস্থের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল। কী হইয়াছে শিশুটির? নীচে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কাল রাত্রে। কতটুকু জল মেঝেতে, এক হাতও হইবে না। ছেলেকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া জননী ঘুমাইয়াছিল, কখন কেমন করিয়া সে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল কে জানে! এক মাসের শিশু নিজে তো নড়িতে চড়িতে পারে না, সেই ভরসায় তক্তপোশের মাচার চারিদিকে বেড়া তাহারা দেয় নাই, দুদিকে স্বামী স্ত্রী শুইয়াছিল, মাঝখানে ছিল শিশু। ছেলেকে বুকে করিয়া ঘুমের ঘোরে জননী কি পাশ ফিরিয়াছিল? ঘুমের ঘোরে ধারে সরিয়া সেই কি সন্তানকে বিসর্জন দিয়াছিল সর্বনাশা বন্যার জলে?

চরডাঙা পৌঁছিয়া দেখা গেল সমস্ত গ্রাম জলমগ্ন, কোথাও একহাত একটু শুকনো জমি নাই। ঘরে ঘরে স্রোতহীন কর্দমাক্ত জলরাশি থমথম করিতেছে। কুবেরের শ্বশুরবাড়ির সকলে আশ্রয় লইয়াছে বড়ো ঘরের চালার তলে কাঠের ছোটো স্থায়ী মাচাটুকুতে।

দুটি গোরু ও বাছুরের জন্য তিনটি সুপারিগাছের মধ্যে মোটা বাঁশের ত্রিকোণ মাচা বাঁধা হইয়াছে, বাড়ির পোষা কুকুরটিও স্থান পাইয়াছে সেখানে। মালার বুড়া বাপ বৈকুণ্ঠ মাচায় বসিয়া ভীত গোরু দুটিকে খড় দিতেছিল, ঘরের চালে বসিয়া বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিল মালার বড়ো ভাই অধর, আর ঘরের ভিতরকার মাচায় উঠিবার মই হইতে এদিকে রান্নাঘরের চাল পর্যন্ত পাশাপাশি দুটি বাঁশ বাঁধিয়া ইহারা যে সাঁকো তৈয়ারি করিয়াছে তার উপরে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল কয়েকটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে। কুবের আসিয়াছে শুনিয়া মালার ছোটো বোন কপিলা মই ধরিয়া নামিয়া আসিল। কুবেরের শাশুড়ি আর নামিল না, ঘরের মাচার উপর হইতেই কন্যা ও নাতিনাতনির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বর্ষার দেবতাকে শাপান্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিল যে এতখানি বয়স তাহার হইয়াছে, এমন প্রলয়ংকর কাণ্ড আর তো সে দেখে নাই বাপের জন্মে! কুবের কি জানে কী সর্বনাশ তাহাদের হইয়া গিয়াছে, বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া পাট পচাইতে দিয়াছিল, অর্ধেক পাট যে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে পাত্তা নাই। ভাসিয়া আর যাইবে কোথায়, কেউ চুরি করিয়াছে নিশ্চয়। হ, গরিব গৃহস্থ তাহারা, কত আশায়

এবার ধানের জমিতে পর্যন্ত পাটের চাষ দিয়াছিল, কে তাহাদের এমন সর্বনাশ করিয়াছে গো!

মাচা হইতে বৈকুণ্ঠ, চালা হইতে অধর, মই হইতে কপিলা আর সাঁকো হইতে উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলি নৌকায় আসিয়া আরাম করিয়া বসিল। কুবের তামাক সাজিয়া দিল বৈকুণ্ঠকে।

কপিলা বলিল, নাও নিয়া আইলা মাঝি, বইনেরে আনলা না ক্যান? কতকাল দেখি নাই বইনেরে! পোলাপানগো তো আইনবার পারতা?

কুবের বলিল, আনুম ভাবছিলাম। তোমরা এহানে কিবা রইছ না জাইনা শ্যাযম্যাশ ডরাইলাম। আসনের লাইগা গোপি কাঁইন্দা সারা হইছিল। তুমি আইলা কবে, কপিলা?

কপিলা মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, আমার কথা থোও।

সহজ স্বাভাবিক প্রশ্নে কপিলার বিরক্তি দেখিয়া কুবের একটু অবাক হইয়া বৈকুণ্ঠের দিকে চাহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ চোখ মটকাইয়া তাকে কী যেন একটা ইশারা করিল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কুবের করিল কী, মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, অ!

কপিলা রূঢ়স্বরে বলিল, হাসলা যে মাঝি?

কুবের বলিল, হাসি নাই কপিলা, হাসুম ক্যান?

কুবেরের বিবাহের সময় বড়ো দুরন্ত ছিল কপিলা। তখন পঙ্গু মালাকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই হয়তো কপিলার দুরন্তপনা অত বেশি চোখে পড়িয়াছিল কুবেরের, অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ। তারপর কপিলার বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়ে হইয়া আঁতুড়ে মরিয়া গিয়াছে বছর দুই আগে। কে জানে কত শান্তশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কপিলা আজকাল, কেমন সংসারী হইয়াছে তাহার মন? আর কি কোনোদিন সে গাছের ডালে কাঁচা বেতের দোলনা বাঁধিয়া দোল খাইবে, কিশোর বয়সের অপূর্ব দেহটিকে ঘাটের উপর হইতে ছুঁড়িয়া দিবে পুকুরের জলে, ডিঙি লইয়া একা একা পালাইয়া গিয়া সকলকে দিবে বকুনি দেওয়ার শাস্তি? রাগের মাথায় এ জীবনে আর কখনও হয়তো সে কুবেরকে চ্যালা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না। না মারুক! একজন চ্যালা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না বলিয়া আপশোশ করিবার কী আছে? খানিক পরে পাশাপাশি দুটি বাঁশের উপর দিয়া কপিলাকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কুবেরের দুচোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। হ, সেই পুরানো দিনের স্মৃতি গাঁথা হইয়া আছে কুবেরের মনে।

জল কমিয়া যাওয়া পর্যন্ত কেতুপুরে তাহার বাড়িতে গিয়া থাকিবার জন্য কুবের সকলকে নিমন্ত্রণ করিল। এ আহ্বান তুচ্ছ করিবার মতো নয়, কিন্তু সকলে গেলে কেমন করিয়া চলে? বাড়িঘর জিনিসপত্র সব সাময়িকভাবে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিলে হইত, সে তো সম্ভব নয়। বোবা গোরু-বাছুরগুলির কী হইবে? যাইতে পারে ছেলেমেয়েগুলি—আর তাদের দেখাশোনা করিবার জন্য কপিলা যদি যায় তো যাক, মালা তো পারিবে না এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চাকে সামলাইতে।

কপিলা যাইবে? বেশ।

কুবেরের শাশুড়ি বড়ো চেঁচায়। সে বলিল, তোমারে কমু কী কুবের, মাইয়ারে নিয়া জ্বইলা মরি—হ রে বাপ, কপিলার কথা কই—মালার লাইগা ভাবুম কেরে? সোনার জামাই তুমি, খোঁড়া মাইয়ারে আমার মাথায় কইরা থুইছ—এই পোড়াকপাইল্যার কথা কই, কই আমাগো কপিলার কথা। অলক্ষ্মীর মরণ নাই!

সে বড়ো দুঃখের কাহিনি। সুখে ঘরকন্না করিতেছিল কপিলা, কী যে শনি ভর করিল তাহার কপালে, শীতের গোড়ায় স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া সে চলিয়া আসিল বাপের বাড়ি! রাগ করিয়া তাহার স্বামী শ্যামাদাস আবার বিবাহ করিয়াছে, কপিলাকে নেয় না।

এ খবর কুবের জানিত না। সে সবিস্ময়ে বলিল, হ?

তারপর কপিলাকে স্বামীর কাছে পাঠানো হইয়াছিল—ফাল্গুন মাসে। শ্যামাদাস তাহাকে বাড়িতে উঠিতে দেয় নাই, খেদাইয়া দিয়াছে। মানুষ তো সে নয়, পশু। তাই তো কুবেরের সঙ্গে তুলনা করিয়া কপিলার মা দিনরাত্রি তাহাকে গাল দেয়।

তাই বটে, পঙ্গু বলিয়া মালাকে সে কখনও অনাদর করে নাই সত্য, সেটা তবে এতখানি প্রশংসার ব্যাপার? মালার জন্য, তাহার দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারের ওই অলস অকর্মণ্য রমণীটির জন্য, কুবের হঠাৎ নিবিড় স্নেহ অনুভব করে ; সৎ গৃহস্থ ও সৎ স্বামী বলিয়া যে প্রশংসা তাহার মালার জননী গলার জোরে দিগ্‌দিগন্তে রটনা করে তাহা যেন মালারই কীর্তি।

খাওয়া-দাওয়ার পর কপিলা ও তাহার ভাইবোনদের সঙ্গে করিয়া কুবের কেতুপুরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। কপিলা খুব সাজিয়াছে। চুলে চপচপে করিয়া দিয়াছে নারিকেল তেল, গায়ে হলুদ মাখিয়া করিয়াছে স্নান, পরিয়াছে তার বেগুনে রঙের শাড়িখানি। স্বামী ত্যাগ করিয়াছে বটে, বয়েস তো তার কাঁচা। আহা, কুটুমবাড়ি যাওয়ার নামে মেয়েটা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিয়াছে।

কেতুপুরে পৌঁছিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। মালা উতলা হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিছু পাট চুরি যাওয়া ছাড়া তাহার বাপ-ভাইয়ের আর কোনো ক্ষতি হয় নাই শুনিয়া সে আশ্বস্ত হইল। মালা শুধু খোঁড়া হইয়া জন্মে নাই, আরও একটি পঙ্গুতা তাহার আছে; সে হাসিতে জানে না, জীবন তাহাকে অলস করিয়া বিষণ্ণ করিয়াছে। ভাইবোনদের কাছে পাইয়া কতকাল পরে যে মুখে তাহার বিষণ্ণতার ছায়ালেশহীন হাসি ফুটিল!

এদিকে স্বস্তি রহিল না কুবেরের। তার মতো গরিব কে আছে জগতে? এই যে এতগুলি মানুষ আসিল বাড়িতে, ইহাদের সে খাওয়াইবে কী? আউশের ফসল নষ্ট হওয়ায় এবার যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে এখন হইতে তাহা টের পাওয়া যায়, জলমগ্না পৃথিবীতে আহার্যের মূল্য বাড়িয়াছে। ইলিশের মরশুম বলিয়া এখন যদি বা কোনোরকমে চলিয়া যায়, তারপর? দু-চার পয়সা জমাইবার আশা ঘুচিয়া গেল। অতিথি আসিয়াছে, অতিথি চলিয়া যাইবে, তারপর সপরিবারে উপবাস করিবে সে। তখন হাত পাতিলে বৈকুণ্ঠ একটি পয়সাও তাহাকে দিবে না।

নিমন্ত্রণ করিয়া ওদের সে তবে আনিয়াছে কেন? তার দুঃখের দিনে যারা ফিরিয়া তাকায়

না, কেন সে তাদের অত খাতির করিতে গেল? সে আদর করিয়া ডাকিয়া না আনিলেও বন্যার কটা দিন ওরা মাচার উপর বেশ কাটাইয়া দিতে পারিত। মনে মনে কুবের রাগিয়া যায়। মালা খুশি হইয়াছে। হাসি ফুটিয়াছে মালার মুখে? স্বামীর দুঃখ না বুঝিয়া যে স্ত্রীলোক বাপ-ভাইয়ের জন্য কাঁদিয়া মরে, হাসিমুখে তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে হয় আখার তলের ছাই! মালা অমন উতলা না হইলে কে যাইত চরডাঙায়? কে আনিত তাহার ভাইবোনদের ডাকিয়া?

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা কুবেরের মাছ ধরিতে যাওয়ার আগে, পিসি সকলকে ভাত বাড়িয়া দেয় : কুবের এইমাত্র খাইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে আরও কয়েকটা প্রাণীকে সারি দিয়া বসিয়া খাইতে দেখিয়া ভবিষ্যতের অনিবার্য ক্ষুধায় তার ভরা পেটের অন্ন যেন মুহূর্তে হজম হইয়া যায়। মালা বসিয়া বসিয়া সকলের খাওয়ার তদবির করে, গোপির পাতের ডালমাখা ভাতটুকু সে আদর করিয়া তাহার ভাইয়ের পাতে তুলিয়া দেয়—এ দৃশ্য কুবের আর দেখিতে পারে না। নৌকায় গিয়া সে বসিয়া থাকে। হয়তো তখন গণেশ ও ধনঞ্জয় কেহই আসে নাই—কুবের চুপ করিয়া বসিয়া থাকে একা। নদীর ঢেউয়ে নৌকা দোল খায়। হু হু করিয়া বহে বাতাস, অন্ধকার এত গাঢ় যে মনে হয় ধোঁয়ার মতোই বুঝি বাতাসে উড়িয়া যাইবে।

কপিলা যে পিছু পিছু আসিয়াছে তা কি কুবের জানে?

তাহার আকস্মিক হাসির শব্দে কুবের ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ঠকঠক করিয়া সে কাঁপিতে থাকে। নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যারাত্রে কে হাসিবে? মানুষ নয়, নিশ্চয় নয়!

কপিলা বলে, তামুক ফেইলা আইছ মাঝি।

কুবের নামিয়া আসিয়া তামাকের দলাটা গ্রহণ করে।

বলে, খাটাসের মতো হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই?

কপিলা বলে, ডরাইছিলা, হ? আরে পুরুষ!

তারপর বলে, আমারে নিবা মাঝি লগে?

বলে আর কপিলা আব্দার করিয়া কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে। মালার বোন না কপিলা? হ। কুবের তাহার দুই কাঁধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো তাহাকে পিছনে হেলাইয়া দেয়, বলে, বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবানি দিমু কপিলা!

কপিলা ধপ করিয়া সেইখানে কাদার উপরে বসিয়া পড়ে, হাসিতে হাসিতে বলে, আরে পুরুষ!

তাহার নির্বিবাদে কাদায় বসা আর শয়তানি হাসি আর খোঁচা দেওয়া পরিহাস—সব বড়ো রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। হঠাৎ কুবেরের বড়ো ভয় হয়। সে সস্নেহে বলে, পাঁক মাইখা মরস কেরে কপিলা? মাইন্‌সে কইবো কী? যা বাড়িত্ যা।

কে জানে কী আছে কপিলার মনে? সে চলিয়া গেলে কুবেরের দুটি চোখের ঔৎসুক্য অন্ধকারে গোপন হইয়া থাকে। কপিলার আনিয়া দেওয়া তামাক সাজিয়া সে টানিতে আরম্ভ

করে। তামাকের ভাগিদার না থাকার আরামটুকুই কি তাহার মানসিক চাঞ্চল্য ক্রমে ক্রমে শান্ত করিয়া আনে, অথবা সে নদীর বাতাস— নায়ের দোলনে পদ্মার প্রেম? মালা যে কোনোদিন ওঠে নাই, হাঁটে নাই, ঘুরিয়া বেড়াইয়া চারিদিকে জীবনকে ছড়াইয়া মেলিয়া রাখিতে পারে নাই, তার জন্য কুবেরের কোনোদিন আপশোশ ছিল না। গতি নাই বলিয়া মালার আবদ্ধ ঘনীভূত জীবন তারই বুকে উথলিয়া উঠিয়াছে—ভাঙা চালার নীচে সংকীর্ণ শয্যায় পঙ্গু মালার তুলনা জগতে নাই। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তামাক পৌঁছাইয়া দিতে সে তো কোনোদিন নদীতীরে ছুটিয়া আসিতে পারে না—বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে পারে না সোজা হইয়া দাঁড়াইতে!

বেগুনি রঙের শাড়িখানি পরিয়া চুলে চপচপে তেল দিয়া শুধু লীলাখেলা করিতেই কপিলা পটু নয়, কুবেরের সেবাও সে করে—জীবনে কুবের কখনও যে সেবার পরিচয় পায় নাই। সারারাত্রি পদ্মার বুকে কাটাইয়া আসিয়া এখন সে না চাহিতে পা ধোয়ার জল পায়, পান্তাভাতের কাঁসিটির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে হয় না, খাইয়া উঠিবামাত্র তামাক আসে, প্রস্তুত থাকে তাহার দীন মলিন শয্যা এবং ফাঁক পাইলেই কোনোদিন গোঁফ ধরিয়া টান দিয়া, কোনোদিন একটা চিমটি কাটিয়া, হাসি চাপিয়া চোখের পলকে উধাও হইয়া—ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।

পরের পেট ভরাইতে ফতুর হইতে বসিয়াও গৃহে তাই কুবেরের আকর্ষণ বাড়ে।

কমে মাঠঘাটের জল।

ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বইকী। একদিন মালার বড়ো ভাই অধর খবর লইতে আসে। কুবেরকে সে সত্যসত্যই কুবের ঠাওরাইয়া রাখিয়াছে কিনা সে-ই জানে, কর্জ চাহে দুটি টাকা। টাকা না পাইয়া তাহার রাগ হয়। সকলকে সে চরডাঙায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। কুবের বারণ করে না, মালাও নয়, ভাইবোনকে কাছে পাওয়ার আনন্দ পুরানো হইয়া আসিতে কতদিন আর লাগে বোনের? তা ছাড়া কপিলার চাপল্য ও হাস্যপরিহাসের জন্য ঈর্ষাও হয়তো মালার হয়, কোনোদিন হয়তো কুবেরের সঙ্গে কপিলার অন্যায় মাখামাখি চোখেও পড়িয়াছে তাহার—একস্থানে ঠায় বসিয়া থাকিলেও দৃষ্টি তো সে পাতিয়া রাখে সর্বত্র।

কিন্তু কপিলা যায় না। ঝগড়া করিয়া গাল দিয়া অধরকে সে ভাগাইয়া দেয়। কে জানে কী আছে কপিলার মনে!

ময়নাদ্বীপ হইতে রাসুর আকস্মিক আবির্ভাবের বিস্ময় গ্রামের লোকের কাছে পুরানো হইয়া গিয়াছে, রাসুর অভিজ্ঞতার গল্প শুনিবার কৌতূহল কাহারও নাই। রাসু বলিতে চায়, সবিস্তারে বারবার আগাগোড়া সমস্ত কাহিনিটা বলিবার জন্য সে ছটফট করে, কিন্তু শ্রোতা পায় না। কত শুনিবে লোকে? শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে সকলের।

হোসেন মিয়া কিছু টাকা দিয়াছে রাসুকে, রাসুর ইচ্ছা টাকাটা দিয়া সে একটি বউ খরিদ

করে, গোপি হইলেই ভালো হয়। কিন্তু কুবের এ প্রস্তাব কানেও তোলে না। কত টাকা দিয়াছে হোসেন মিয়া তাহাকে? হাজার না লাখ? আর কী আছে রাসুর—ঘর-দুয়ার, জীবিকার উপায়? তা ছাড়া গোপির পাত্র একরকম ঠিক হইয়াই আছে—গণেশের শালা যুগল। যুগলের মতো পাত্র থাকিতে যার তার হাতে কুবের মেয়ে দিবে কেন?

গোপিকে কিন্তু বড়োই পছন্দ হইয়াছে রাসুর।

ময়নাদ্বীপের গল্প করিবার ছলে সে কুবেরের বাড়ি আসে, আড়চোখে আড়চোখে সারাক্ষণ সে গোপির দিকে তাকায়, পরির মতো সুন্দরী মনে হয় গোপিকে তাহার। ভাইকে কোলে করিয়া বাঁকা হইয়া কী তাহার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা! হ, রুখো রুখো লালচে বটে চুলগুলি গোপির, কপালটা একটু উঁচুই, থ্যাবড়ানো নাকের নীচে উত্তোলিত ওষ্ঠে ঠেকিয়া নোলকটা তাহার দুলিতে পায় না, আর হ, বড়ো নোংরা গোপি। তবু তো রাসু চোখ ফিরাইতে পারে না! তবু তো তার মনে পড়ে না এমন অতুলনীয় রূপ সে কোথাও দেখিয়াছে! কী রং গোপির! কী মনোহর তাহার চলাফেরা, কী চাউনি!

বয়স রাসুর বেশি হয় নাই, যুগলের চেয়েও তার বয়স কম। নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া জীবনটা আবার গুছাইয়া লইবার সময় তাহার পার হইয়া যায় নাই। গোপিকে পাইলে আবার সে আরম্ভ করিতে পারে—বয়স্থা বাড়ন্ত মেয়ে গোপি, বিবাহের এক বছরের মধ্যে ও স্বামীর ঘর করিতে আসিবে, পাঁচ-ছ বছরের একটা মেয়েকে বিবাহ করিয়া তার বড়ো হইবার আশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবার ধৈর্য রাসুর আর নাই। যাদের সে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে ময়নাদ্বীপে, তাড়াতাড়ি আবার তাদের ফিরিয়া পাওয়া চাই। একা একা বড়ো কষ্ট হইতেছে রাসুর। পীতম মাঝির সঙ্গে রাসুর কলহ হইয়া গিয়াছে। হোসেন মিয়ার দেওয়া টাকাটা বাগাইয়া লওয়ার জন্য পীতম মাঝি বড়োই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাসু তাই পৃথক হইয়া গিয়াছে। কে জানিত গ্রামের মধ্যে পীতমের মেয়ে যুগীই সর্বস্বান্ত পিসতুতো ভাইটিকে এতখানি খাতির করবে। শীতলকে দিয়া বাবুদের বলিয়া নিজের ঘরের কাছে খানিকটা জমি যুগীই রাসুকে জোগাড় করিয়া দিয়াছে—রাসু একখানা ঘর তুলিয়াছে সেখানে।

সেই ঘরে রাসু বাস করে একা, হয়তো ধ্যান করে গোপির! বিকালে কেতুপুর গ্রামের মধ্যে সওদা আনিতে যাওয়ার সময় পথের নির্জনতম অংশে কোনোদিন গোপি রাসুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায়।

রাসু বলে, কই যাও গোপি? সে একটু স্নেহ-ব্যঞ্জক হাসি হাসে। গাঁট হইতে বাহির করে একটি কাচ বসানো পিতলের আংটি আর পুঁতির মালা, বলে, নিবা?

গোপি খুশি হইয়া উপহার গ্রহণ করে। রাসুকে ভালোই লাগে তাহার, রাসুর জন্য সে একটু দুঃখ বোধ করে। কোথায় সেই ময়নাদ্বীপ কে জানে, সকলকে রাসু সেখানে হারাইয়া আসিয়াছে, বড়ো কষ্ট পাইয়াছে সে জীবনে। তা ছাড়া রাসুর কথাগুলি ভারী মিষ্টি, শুনিতে বড়ো ভালো লাগে গোপির। আর কী খাতিরটা রাসু তাহাকে করে। কত যেন সে বড়ো হইয়াছে, এগারো বছরের মেয়ে সে নয়।

যুগীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রাসু পরামর্শ করে, একটা কী উপায় ঠাওরানো যায় না কুবেরকে

যাহাতে রাজি করানো যায়? পরামর্শ অনেক হয়, উপায় হয় না। শীতলের অনুপস্থিতিতে তাহার পরিষ্কার শয্যায় আরাম করিয়া বসিয়া তাহার হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে পরামর্শ করিতে পারাটুকুই লাভ হয় রাসুর। আর যুগীর সমবেদনা। রাসুকে যুগী খুব খাতির-যত্ন করে, রাসুর মুখে ময়নাদ্বীপের কাহিনি বারবার শুনিয়াও সে শ্রান্ত হয় না। কত বাসিন্দা ময়নাদ্বীপে? কী কী ফসল হয়? দ্বীপের চারিদিকে বুঝি সমুদ্র? আচ্ছা, সমুদ্র কত বড়ো—পদ্মার চেয়েও বড়ো বুঝি? আজও যুগী রাসুকে এইসব প্রশ্ন করিতে ভালোবাসে। যুগীর বয়স বেশি নয়, বছর বাইশ—বড়ো শান্ত তাহার স্বভাব, বড়ো সরল তাহার মন। শীতল তাহাকে সুখে রাখিয়াছে, আড়াল করিয়া রাখিয়াছে জেলেপাড়ার দারিদ্র্য ও হীনতা হইতে। যুগীর মনে অপরিমিত সন্তোষ। এত দয়ামায়া, এমন কোমলতা জেলেপাড়ার আর কোনো মেয়ের নাই। জেলেপাড়ার কারও ঘরে কোনোদিন যদি অন্ন না থাকে, চুপিচুপি একবার যুগীর কাছে আসিতে পারিলে আর তাহার উপবাসের ভয় থাকে না—দুঃখের কাহিনি যে যত জমজমাট করিয়া বলিতে পারে ছলছল চোখে যুগী তাহাকে চাল দেয় তত বেশি—খরচের পয়সা দান করিয়া শীতলের বকুনি শোনে। শীতল লোকটা বড়ো কৃপণ, যুগীর দান করা স্বভাবটা সে পছন্দ করে না কিন্তু এমন আশ্চর্য মন মানুষের, যুগীর এই মন্দ স্বভাবের জন্যই তাহাকে শীতল ভালোবাসে বেশি। যুগীকে সে কৃপণ হইতে বলে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিলে যুগী যেদিন ভয়ে ভয়ে তাহাকে শোনায় না যে একজন আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙিয়া যা পারিয়াছে আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেদিন মনটা যেন খুঁতখুঁত করে শীতলের।

মাছের মূল্য বাবদ কুবের কয়েক আনা পয়সা পাইত। শীতল কখনও ঋণ পরিশোধ করে না। তাগিদ করিয়া করিয়া কুবের হয়রান হইয়া গিয়াছে। তবু, একদিন সকালে আবার সে আশা করিয়া আসিল।

যুগী রাঁধিতেছিল, শীতল আর রাসু করিতেছিল গল্প। কুবেরকে দেখিয়া রাসু চঞ্চল হইয়া উঠিল, বসিতে দিয়া খাতির করিয়া কলিকাটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, তামুক খাও।

না, কুবেরের বসিবার সময় নাই, তামাক খাওয়ার সময় নাই! শীতল তাড়াতাড়ি পয়সাটা দিয়া দিক, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে—বসিয়া তামাক টানিতে আসিয়াছে নাকি সে? হু, কুবের আজ রাগিয়াছে। আজ সে মাছের দাম আদায় করিয়া ছাড়িবে। শীতল প্রথমে অমায়িক হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এত রাগ কেন কুবেরের, এই সকালবেলা? তারপর সেও রাগিয়া যায়, বলে, যা যা দিমু না পয়সা, কর গিয়া নালিশ!

রাসু বুঝি কুবেরকে খুশি করতে চায়, সে বলিল, দ্যান শেতলবাবু, দিয়া দ্যান পয়সা।

পয়সা দিল যুগী। কলহের মাঝখানে দশ আনা পয়সা আনিয়া কুবেরের সামনে রাখিয়া দিল, শীতলকে ধমক দিয়া বলিল, সামান্য ক-আনা পয়সার জন্য এত কাণ্ড করা কী জন্য? কত কর্তৃত্ব যুগীর! শীতল কথাটি বলিল না, কুবেরের দিকে কড়া চোখে চাহিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।

পয়সা কুড়াইয়া কুবের উঠিল, সঙ্গে উঠিল রাসু। কী বিনয় রাসুর, কী সব তোষামোদে

কথা! পথ চলিতে চলিতে রাসু নানা কথা বলে। এবার সে একটা ব্যাবসা আরম্ভ করিবে—ব্যাবসা ছাড়া পয়সা নাই মানুষের, একটা সে দোকান দিবে দেবীগঞ্জে। কিসের দোকান এখনও সে তা ঠিক করে নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কিছু ঠিক করিয়া লইবে—কুবের কী পরামর্শ দেয়? জীবনে উন্নতি করিবে রাসু, প্রাণপণ করিয়া লাগিলে কী না হয় জগতে ? তা ছাড়া পুরুষের ভাগ্যের কথা কে জানে! আজ ফকির—কাল রাজা! কুবের গম্ভীর মুখে সায় দিয়া বলে, হ। ভাবে, ময়নাদ্বীপে গিয়া বড়ো বড়ো কথা বলিতে শিখিয়া আসিয়াছে রাসু, চাল দিতে শিখিয়াছে।

মাঠের দিকে চাহিলে বোঝা যায় জল কোথায় নামিয়া গিয়াছে, ধানের ফসল কাত হইয়া পড়িয়া আছে। পদ্মা হইতে আজ জোর বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে অসংখ্য পাখির কলরব, শিশিরভেজা ডাঙায় ছড়াইয়া আছে সোনার রোদ, শরৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। নদীতীরে কাশের বন এবার সাদা হইয়া উঠিবে। কুবেরের সঙ্গে রাসু তাহার বাড়ি পর্যন্ত আগাইয়া যায়। না, গোপি এখন বাড়ি নাই। কপিলার সঙ্গে সে জল আনিতে গিয়াছে নদীতে। কুবের রাসুকে বসিতে বলে না, পিসির নিরিবিলি ঘরখানায় গিয়া ঢোকে ঘুমের জন্য, রাসু আস্তে আস্তে ফিরিয়া যায়। যায় সে নদীর ধারে, গাল সে খায় কপিলার, তারপর হনহন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে কেতুপুর গ্রামের দিকে। না, নদীর ধারে ওভাবে দাঁড়ানো উচিত হয় নাই। কপিলা যদি বলিয়া দেয় কুবেরকে?

৫

ভাদ্রের পরে আশ্বিন। আশ্বিনের মাঝামাঝি পূজা।

একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। কালবৈশাখী কোথায় লাগে। সারাদিন টিপি টিপি বৃষ্টি হইল, সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া আসিল নিবিড় কালো মেঘ, মাঝরাত্রে শুরু হইল ঝড়। কী সে বেগ বাতাসের আর কী গর্জন! বড়ো বড়ো গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মতো বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে। জেলেপাড়ার বৃদ্ধ ও রমণীরা হাহাকার করিয়া রাত কাটাইল, ছেলেমেয়েরা কেহ ভয়ে নিষ্পন্দ হইয়া রহিল, কেহ গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইলিশের মরসুম শেষ হইলে মোটা উপার্জনের সুযোগ দুদিন পরে ফুরাইয়া যাইবে, জেলেপাড়ার কোনো ঘরে আজ বুঝি সমর্থ দেহ পুরুষ নাই, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে দূর দূরান্তরে। কে ফিরিবে প্রভাতে, কে ফিরিবে না? ঝড় শুরু হইলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে—ঝড়ের দেবতা বসিবেন, শান্ত হইবেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা কপাল কুটিয়া মধুসূদনকে ডাকিয়াছে। এ কি রোষ দেবতার? কেন এ প্রলয়?

সকালে ঝড় কমিল কিন্তু একেবারে থামিল না। সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল গুঁড়িগুঁড়ি। জেলেপাড়ার দিকে তাকানো যায় না, ঘন-সন্নিবিষ্ট

কুটিরগুলিকে কে যেন আবর্জনার মতো নাড়িয়া চাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। কোনো ঘর কাত হইয়া পড়িয়াছে, কোনো ঘরের চালা নাই, কোনো চালার অর্ধেক খড় উড়িয়া গিয়া বাঁশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উঠান ভরিয়া পথ জুড়িয়া জমিয়াছে গাছের ডালপালা। কুবেরের শোবার ঘরখানা পড়িয়া গিয়াছে, গোপি খুব আঘাত পাইয়াছে, কে জানে ডান পা-টি তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে কিনা। চালা উড়িয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছে পীতমের গোয়ালঘরের, হীরু আর সিধুর একখানা ঘরও দাঁড়াইয়া নাই, অনুকূলের তিনখানা ঘরের একটার চালা নাই, বাকি দুখানার চালায় নাই খড়। রাসুর ঘরখানা ছিল একেবারে ফাঁকায়, ভিটা আর দুটি খুঁটি ছাড়া ঘরের চিহ্নটুকুও দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতলের বাড়ির চারিদিকে বড়ো বড়ো গাছ, তার একটা গাছ পড়িলে বাড়ি তাহার পিষিয়া যাইত, কিন্তু গাছের আশ্রয়েই ঘরগুলি তাহার বাঁচিয়া গিয়াছে। জেলেপাড়ায় আরও অনেকেরই ক্ষতি হইয়াছে অল্পবিস্তর। মুসলমান মাঝিদের মধ্যে ক্ষতি হইয়াছে আমিনুদ্দির বেশি। প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরে আমের গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়াইয়া যে ঘরে আমিনুদ্দির বউ আর ছেলেমেয়ে তিনটি ছিল সেই ঘরখানাকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। আমিনুদ্দির বউ থেঁতলাইয়া মরিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে, সকালে টানিয়া বাহির করার সময় ছেলেটার প্রাণ ছিল, ঘন্টাখানেক পরে সে-ও শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু মেয়েটার কিছু হয় নাই। আমিনুদ্দি কোথায় আছে কে জানে, হয়তো ডাঙায় নয়তো পদ্মার উত্তাল জল-তলে, অত বড়ো মেয়েটা তাহার কারো সান্ত্বনা মানিতেছে না, হাউহাউ করিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। যে মেয়ের পর্দা রাখিবার জন্য গরিব আমিনুদ্দি কুটির ঘেরিয়া উঁচু বেড়া দিয়াছিল, আজ যার খুশি তাকে দেখিয়া যাও। কালো চোখে কাল সে যে কাজল দিয়াছিল এখনও তা ধুইয়া যায় নাই—বেড়ার ফাঁকে ওর কাজল চোখের সলাজ চাহনি দেখিয়া কাল অপরাহ্নে জহরের জোয়ান ছেলে নাসির বুঝি খুশি হইয়া পদ্মায় নৌকা ভাসাইয়াছিল, পদ্মা হয়তো তাকে এতক্ষণ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে পৃথিবীর বুক হইতে।

ভীত বিবর্ণ মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে জেলেপাড়ার নরনারী পদ্মাতীরে গিয়া দাঁড়ায়, আরক্ত চোখে চাহিয়া থাকে উন্মত্ত জলরাশির দিকে। ঘাটে তিনটি নৌকা বাঁধা ছিল, একটি অদৃশ্য হইয়াছে, দুটি উঠিয়া আসিয়াছে ডাঙায়। খানিক দূরে গাছপালা সমেত খানিকটা ডাঙা ধ্বসিয়া গিয়াছে, আরও খানিকটা অংশ ফাটল ধরিয়া আছে, শীঘ্রই ধ্বসিবে।

পদ্মাতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোনো লাভ নাই, চাহিয়া চাহিয়া চোখ ফাটিয়া গেলেও কাল যারা নদীতে পাড়ি দিয়াছিল তাদের দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যে নদীতে ডুবিয়াছে সে তো গিয়াছেই, ডাঙায় যারা আশ্রয় পাইয়াছে পদ্মা শান্ত না হইলে তাদেরও ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়।

ডাঙা-পথে আসিতে পারে।

কিন্তু এখনও মাঠে ঘাটে জল একেবারে সরিয়া যায় নাই, কে কোথায় ডাঙা পাইয়াছে কে জানে, হয়তো সেখান হইতে ডাঙায় পায়ে হাঁটিয়া আসিবার সুবিধা নাই। গৃহের জন্য

মন হয়তো তাহাদের উতলা হইয়াছে, ভোরের আলো ফুটিলে এই উন্মাদিনী নদীর তীর ঘেঁষিয়া নৌকা বাহিয়া হয়তো তাহারা গ্রামে ফিরিবার চেষ্টা করিবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিলে ধীরে ধীরে বাতাস পড়িয়া গেল। পদ্মা শান্ত হইয়া আসিল। অপরাহ্নে একটি দুটি করিয়া জেলেপাড়ার নৌকাগুলি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে যারা আসিয়া পড়িল, সকলে তাদের ঘিরিয়া জুড়িয়া দিল কলরব।—বাকি সব? অন্য সকলের খবর কী? সকলের খবর তাহারা দিতে পারিল না, কে কোথায় তীরে ভিড়িয়াছে কে জানে, দু-চারজনের খবর মাত্র তাহারা বলিতে পারিল। যাদের সংবাদ জানা গেল তাদের উদ্‌বিগ্ন আত্মীয়স্বজনের মুখ হইতে একটা কালো পর্দা যেন সরিয়া গেল। খবর যাদের মিলিল না তাদের আপনজনেরা আবার নীরবে পদ্মার সীমাহীন বুকে দৃষ্টি পাতিয়া রাখিল। তবে প্রত্যেকটি নৌকাই এই একটি আশার বারতা বহিয়া আনিতে লাগিল যে কারও প্রাণহানি হইয়াছে এ সংবাদ তাহারা শুনিয়া আসে নাই। বুক বাঁধিয়া সকলেই প্রতীক্ষা করিতে পারে, হয়তো ব্যর্থ হইবে না।

আমিনুদ্দি ও নাসির একসঙ্গেই ফিরিয়া আসিল। আমিনুদ্দির জন্য কেহ ঘাটে আসে নাই। জহর আসিয়াছিল, নাসিরকে দেখিয়া সে শুধু বলিল, বাপজান, ফির্‌যা আলি রে?—বলিয়া আমিনুদ্দির দিকে চাহিয়া একেবারে চুপ করিয়া গেল। কারো মুখে কথা নাই। আমিনুদ্দিকে দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমিনুদ্দি এদিক ওদিক চাহিল, তারপর ভীত উৎসুক কণ্ঠে জহরকে জিজ্ঞাসা করিল, খপর কও মিয়াবাই, ভালা নি আছে বেবাকে? চুপ মাইরা রইলা কেরে, আঁই?

কারো কিছু বলিবার ছিল না। হাত ধরিয়া জহর তাহাকে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

তারপর আসিল কুবের ও গণেশ। আসিল তাহারা অনুকূলের নৌকায়, ধনঞ্জয়ের নৌকাটি ডুবিয়া গিয়াছে। বোকা গণেশের একটা পা মচকাইয়া গিয়াছিল, ঝড়ে নয়, পা পিছলাইয়া একটা সে আছাড় খাইয়াছিল ডাঙায়। উলুপী আজ সারাদিন একরকম পদ্মাতীরেই কাটাইয়াছে, গণেশকে ধরিয়া সে-ই বাড়ি লইয়া গেল। কুবেরের জন্য কেহ আসে নাই। পরের মুখে সে তাহার গৃহের বৃত্তান্ত শুনিল। বড়ো ঘরটা পড়িয়া গিয়াছে? যে ঘর ছাইবার জন্য হোসেন মিয়া শণ দিয়াছিল? গোপির পায়ে চোট লাগিয়াছে? বিবর্ণ মুখে কুবের বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। ঘর দুয়ার অনেকেরই পড়িয়াছে, সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে আমিনুদ্দির, কিন্তু তাহার নিজের ঘরখানা পড়িয়া যাওয়ার চেয়ে বড়ো দুঃসংবাদ কুবেরের কাছে আর কিছুই নয়। কবে আবার সে ঘর তুলিতে পারিবে কে জানে। মাথা গুঁজিবে কোথায়?

পথে দেখা হইল কপিলার সঙ্গে। কুবেরকে দেখিয়াই কপিলা উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল—বড়ো উচ্ছ্বাস কপিলার। বলিল, ফিরা আইছ মাঝি? মুখ রাখছেন—ঠাহুর আমার মুখ রাখছেন—আমি না মানত কইরা থুইছি পাঁচ পহার হরিলুট দিমু!

কুবের বিব্রত হইয়া বলিল, কাঁদ ক্যান?

সঙ্গে চলিতে চলিতে কপিলা আত্মসংবরণ করিল।

পায় বিষম চোট পাইছে মাইয়া। শুনছ নি বিত্তান্ত?

কুবের মাথা হেলাইয়া বলিল, হ। ফুইলা গেছে না?

বিষম ফুলছে! দিনডা ভইরা চিল্লাইয়া মরছে মাইয়া।

চারিদিকে ভাঙা গাছ, ভাঙা ঘর, পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত পথ, কুবেরের চোখে জল আসে। ঘরের কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। ঘর কই কুবেরের! ভাঙিয়া অঙ্গনে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। পিসির ঘরে সকলে আশ্রয় লইয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া কুবের ঢেঁকিটার উপর বসিয়া পড়িল। গোপি শুইয়া শুইয়া কাতরাইতেছে। পায়ে তাহার চুন হলুদ মাখানো হইয়াছে, হাঁটুর কাছে বেজায় ফুলিয়াছে। মালার চোখে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি। গতরাত্রের প্রলয়ংকর কাণ্ড ভীরু পঙ্গু নারীটিকে আধমরা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, এখনও সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। কুবের আসিয়া পড়াতে সে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পিসি ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ঝড়বাদল ভূমিকম্প কিছুই পিসির ভাত রাঁধা বন্ধ করিতে পারে না। খানিক পরে উঠিয়া কুবের ভাত খাইল। তারপর গোপির কাছে একটু বসিল। যন্ত্রণায় মেয়েটার মুখ নীল হইয়া গিয়াছে। কী করিবে কুবের, যন্ত্রণা লাঘবের কী মন্ত্র সে জানে, গোপিকে যাতে এতটুকু আরাম দিতে পারে? নীরবে চাহিয়া দেখা ছাড়া কোনো উপায় নাই। মালা ধীরে ধীরে বলিতে থাকে মড়মড় করিয়া ঘর ভাঙিয়া পড়ার সময় আতঙ্কে দিশেহারা হইয়া ছুটিয়া বাহিরে যাওয়ায় কীভাবে গোপির উপর চালটা আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘরে থাকিলে মেয়েটার কিছু হইত না। ঝড়ের সময় যে বাহিরে যাইতে নাই, ঘরের মধ্যে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ, সেটুকু বুদ্ধি তো মেয়ের নাই। শুনিতে শুনিতে কুবের ঢুলিতে থাকে।

হ, কুবেরের ঘুম পাইয়াছে। উন্মুক্ত নদীতীরে বসিয়া সে কাটাইয়াছে ঝড়ের রাত্রি, সকালে হাঁটিয়া আসিয়াছে দেবীগঞ্জে, দুটি মুড়ি শুধু সে খাইয়াছে, বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত দুর্ভাবনায় ঢিপঢিপ করিয়াছে বুকের মধ্যে। এখন পেট ভরিয়া খাইয়া উঠিয়া আর তাহার জাগিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই। মালার সব কথা তার কানে যায় না। গোপির মাথার কাছে সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোনোমতে কাত হইয়া সে একসময় ঘুমাইয়া পড়ে।

সন্ধ্যার আগে জেলেপাড়ার সকলেই ফিরিয়া আসিল। পদ্মার গ্রাসে কেহ যায় নাই। পীতম মাঝির নৌকাটি শুধু মাঝ-নদীতে ঝড়ের মুখে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকায় ছিল পীতমের ছেলে মাখন, কুবেরের প্রতিবেশী সিধু আর তার ভাই মুরারি—অর্ধমৃত অবস্থায় একটা চরে উঠিয়া রাত কাটাইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, আর বলিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের বাহাদুরির কাহিনি, পাহাড়-সমান ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া কীভাবে তাহারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

কয়েকটা দিন বড়ো গোলমালের মধ্যে কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে ভাঙা ঘরগুলির সংস্কারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। কেতুপুরের দু-চারখানা ঘরবাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, একদিন মেজোকর্তা অনন্ত তালুকদারের সভাপতিত্বে গ্রামবাসীর এক সভা হইয়া গেল। ক্ষতিগ্রস্ত আর দুঃস্থদের জন্য চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হইল। অনন্তবাবু নিজে দান করিলেন দশ টাকা,

গ্রাম হইতে আরও পনেরো টাকা উঠিল। তার মধ্যে সাত টাকা দেওয়া হইল কেতুপুরের নন্দ ভট্টাচার্যকে ; আহা, ব্রাহ্মণের দুখানা ঘর পড়িয়া গিয়াছে। জেলেপাড়ার জন্য দেওয়া হইল দশ টাকা, দু টাকা করিয়া পাঁচজনকে। বাকি টাকাটা বোধ হয় ফান্ডে জমা রহিল।

সুখের বিষয় দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এইসময় হোসেন মিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইল, তারপর দাড়ি নাড়িয়া বলিল, না, টাকা কর্জ দিমু না, ছন দিমু, বাঁশ দিমু, নিজে খাড়াইয়া তোমাগো ঘর তুইল্যা দিমু—শ্যাষে নিকাশ নিয়া খত লিখুম, একটা কইরা টিপ দিবা।

তাই সই।

পুরাতন জীর্ণ ঘরের বদলে যদি নূতন ঘর ওঠে, খত লিখিয়া দিতে আর আপত্তি কী? ঘর যাহাদের পড়িয়া গিয়াছিল সকলে তাহারা খুশি হইয়া উঠিল। যাহাদের ঘর পড়ে নাই তাহারা দুঃখিত হইয়া ভাবিল, ঘরদুয়ার তাহাদেরও পড়িয়া গেলে মন্দ হইত না!

সকলেই সাগ্রহে হোসেন মিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিল, করিল না শুধু আমিনুদ্দি। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না মিয়া, ঘর দিয়া আমার কাম নাই।

আমগাছের তলে তাহার ঘরখানা যেমন নিষ্পেষিত হইয়া পড়িয়াছিল তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল। সত্যিই তো, ঘর দিয়া আমিনুদ্দি কী করিবে? কে আছে আমিনুদ্দির? কার জন্য আবার সে দুঃখের, দারিদ্র্যের নীড় বাঁধিবে? জেলেপাড়ার সকলেই আবার পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়াছে, আমিনুদ্দি কোথাও যায় না, কার জন্য পদ্মার অতল জলে সে জীবিকার সন্ধান করিবে? শুধু মেয়েটা আছে—মমীন। কেন আছে কে জানে! সারাদিন মমীন মৃদুস্বরে কাদে, আমিনুদ্দি চাহিয়াও দেখে না, না ডাকে কাছে, না বলে মেয়ের সঙ্গে কথা।

ক্রমে ক্রমে সকলের নূতন খুঁটি নূতন বেড়া ও নূতন চালার ঘরগুলি সমাপ্ত হইল। হোসেন মিয়া মজুরদের কী ইঙ্গিত দিয়াছিল সে-ই জানে, কুবেরের ঘরটা উঠিল সকলের আগে। ঘর দেখিতে আসিয়া হোসেন মিয়া গোপির জন্য বড়ো দরদ দেখাইল। বলিল, হাসপাতালে নিয়া যাও কুবের বাই, জবর চোট পাইছে মালুম হয়।

তারপর একখানা খত বাহির করিয়া বলিল, টিপ সই দেও কুবের—একুশ টাহা দশ আনার খত লিখিছি—বাদ দিছি দুই টাহা। টিপ সই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিবা—না দিলি মামলা করুম না বাই!—হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির? লিখা থুইলাম, হিসাব থাকব—না-ত কিসির কাম খত দিয়া?

কুবের বলিল, পুরান বাঁশ, পুরান বেড়া দিলি খরচা কম হইত মিয়া বাই!

ক্যান? পুরান বাঁশ দিবা ক্যান? খরচার লাইগা ভাইবো না, খরচা তো দিছি আমি! না, দিই নাই?

হ, মিয়া বাই দিছেন, আপনেই দিছেন।

টিপসই দিয়া কুবের হোসেনের মুখের দিকে চাহিল! বড়ো ভয় করে কুবের হোসেন মিয়াকে, বড়ো টান তাহার হোসেন মিয়ার দিকে। কী জাদুমন্ত্রে তাহাকে বশ করিয়াছে লোকটা?

গোপির পায়ের ব্যথাও কমে না, ফোলাও কমে না। মেয়েটাকে নিয়া মহা মুশকিলে

পড়িয়াছে কুবের। মালার মতো গোপিও কি শেষ পর্যন্ত খোঁড়া হইয়া যাইবে? কী ব্যবস্থা করা দরকার কুবের বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হোসেন মিয়ার কথামতো সদরের হাসপাতালে লইয়া যাইবে নাকি? সে তো কম হাঙ্গামার ব্যাপার নয়! অতখানি পথ গোপিকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে? ব্যথায় সে বিছানাতেই পাশ ফিরিতে পারে না, অত নাড়াচাড়া তাহার সহিবে কেন? অথচ পায়ের যা অবস্থা গোপির, শীঘ্রই কোনো ব্যবস্থা না করিলে নয়।

ইতিমধ্যে পূজা আসিয়া পড়িল। চরডাঙা হইতে একদিন আবার আবির্ভাব ঘটিল অধরের। আবার সে রাগারাগি করিয়া সকলকে লইয়া যাইতে চাহিল। ছেলেমেয়েগুলি তাহার সঙ্গে ফিরিয়া গেল চরডাঙায়, কপিলা গেল না। বলিল, কেন, ঘর পড়িয়া গিয়া ঢেঁকিঘরটাতে যখন তাহারা সকলে একসঙ্গে মাথা গুঁজিয়া ছিল, অসুবিধার অন্ত ছিল না, তখন অধর আসিতে পারে নাই? এখন নতুন ঘর উঠিয়াছে, থাকিবার কোনো অসুবিধা নাই, এখন সে যাইবে কেন এদের এই বিপদের মধ্যে ফেলিয়া? কুবেরও ইহাতে সায় দিয়া বলিল, হ, কেন যাইবে কপিলা তাদের এই রিপদের সময়? কপিলা সত্যিই প্রাণ দিয়া সকলের সেবা করিতেছিল, বড়ো কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল কুবেরও তাহার কাছে। বড়ো ভালো মেয়ে কপিলা। কেন যে ওর বোকা স্বামীটা ওকে ত্যাগ করিয়াছে!

কেতুপুরে চারদিন পূজার ঢাক-ঢোল বাজিল—উৎসব হইল। জেলেপাড়ার ছেলেবুড়ো দুবেলা ঠাকুর দেখিল, কেহ কেহ তাড়ি গিলিয়া খুব মাতলামি করিল, শীতল একদিন একটা দেশি মদের বোতল সাবাড় করিয়া রাসুকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া পিটাইয়া দিল। রাসুর উপর তাহার এত রাগ কেন কে জানে!

লখার সঙ্গে কপিলা একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর দেখিতে গিয়াছে, খানিক পরে কুবেরও গুটিগুটি গিয়া হাজির। গিয়া দেখে শীতলের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছে কপিলা। বাবুদের কর্মচারী শীতল, পূজাও বাবুদেরই—ভাবখানা দেখ শীতলের, সে-ই যেন সর্বেসর্বা এখানে! ওর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া এত কথা কিসের কপিলার? তারপর শীতল প্রসাদ চাহিয়া আনিয়া কপিলার আঁচলে বাঁধিয়া দেয়, কপিলা একগাল হাসে। এত লোকের মধ্যে কপিলার এই নির্লজ্জ আচরণে রাগে কুবেরের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। সে ডাকিয়া বলে, লখ্যা! ল বাড়িত্ যাই।

কপিলা বলে, মাঝি আইছ নাকি? খাড়াও মাঝি, আমি যামু, মারে পেন্নাম কইরা লই।

কুবের বলে, লখ্যা, আইলি রে হারামজাদা পোলা?

কপিলা প্রণাম শেষ করিতে করিতে লখাকে সঙ্গে করিয়া কুবের জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। একটু পথ গিয়াই গতি তাহার হইয়া আসিল মন্থর। না, কপিলার জন্য ফিরিয়া সে যাইবে না, তবে আস্তে আস্তে হাঁটিতে দোষ নাই। কপিলা আসিয়া সঙ্গ নেয় তো নিক। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কপিলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া ঠিক কর্তব্য হইবে না। হয়তো শীতলকেই সে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে বলিবে! এতখানি অন্ধকার রাস্তা

শীতলের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিবে কপিলা? তার চেয়ে বিড়ি কিনিবার ছলে এখানে কুবেরের একটু দাঁড়ানোই ভালো।

বিড়ি কিনিতে কিনিতে কপিলা আসিয়া পড়িল। কুবের কথাটি বলিল না। তিনজনে নীরবে চলিতে লাগিল বাড়ির দিকে। কপিলা আড়চোখে কুবেরের মুখের দিকে তাকায়, কিছু ঠাহর হয় না অন্ধকারে। চলিতে চলিতে দেখা হয় রাসুর সঙ্গে, যুগীকে লইয়া সে ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে।

কপিলা যুগীকে বলে, বইন, এক কাম করবা? আমাগো লখারে লইয়া যাও।

কুবের আপত্তি করিয়া বলে, ক্যান, ঠাকুর দ্যাখে নাই লখা?

কপিলা বলিল, পোলাপান, সাধ নি মেটে দেইখা? তোমার লখা বুড়া তো হয় নাই মাঝি, একনজর দেইখা ফাল দিয়া বাড়িত্ ফিরবো? যা রে লখা যুগী মাসির লগে—দেইখো বইন পোলারে, পোলা বড়ো বজ্জাত।

মতলব কী কপিলার? লখাকে সরাইয়া দিল কেন? কিছুই যেন বুঝিতে পারা যায় না। কপিলা নীরবে পথ চলে, কুবের মনে মনে রাগিতে থাকে। শেষে একটা তেঁতুল গাছের তলে, পথের যেখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকার রচিত হইয়াছে সেখানে হঠাৎ কুবের শক্ত করিয়া কপিলার আঁচল চাপিয়া ধরে, বলে, শীতলের লগে অত কথা কিসের তর, আঁই?

কপিলা বলে, কী কর মাঝি? খুইলা পড়ব যে পেরসাদ? আঁচলটা কপিলা টানিয়া ছাড়াইতে চেষ্টা করে, মিনতি করিয়া বলে, পোলাপানের লাখান কইরো না মাঝি, ছাড়— রাস্তার মদ্যি ইডা কেমনতর কাণ্ড জুড়লা?

বলিতে বলিতে আর কপিলা আঁচল টানাটানি করে না, কুবের তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে শান্ত হইয়া থাকে, হঠাৎ বড়ো যেন করুণ কণ্ঠে বলে, মনডা ভালো না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়ো।

কুবের তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করে, মন কাতর ক্যান রে কপিলা?

কে জানিত কপিলা এমন উত্তর দিবে!

সোয়ামিরে মনে পড়ে মাঝি।

হ? আগাগোড়া সব তাহা হইলে ফাঁকি কপিলার, সব ছল, এতক্ষণ রসিকতা করিতেছিল কুবেরের সঙ্গে! ভালো, কুবেরও রসিকতা জানে।

কপিলার গালটা সে টিপিয়া দেয়, হি হি করিয়া হাসে : বলে, তাই ক কপিলা, তাই ক! যে সোয়ামি দূর কইরা খেদাইয়া দিছে তার লাইগা মনডা পোড়ায় তর! গেলেই পারস সোয়ামির ঘর?

যামু।

বলিয়া কপিলা হনহন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে।

৬

সেদিন রাত্রে গোপির পায়ের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া গেল। তাহাকে নূতন ঘরে আনা হইয়াছিল, সারারাত সে ছটফট করিয়া গোঙাইয়া কাটাইয়া দিল। মালা জাগিয়া বসিয়া রহিল তাহার শিয়রে। কুবেরও অনেক রাত অবধি জাগিয়া রহিল। তারপর সে ঘুমাইয়া পড়িল বটে কিন্তু ভালো ঘুম হইল না। শেষরাত্রে উঠিয়া বসিয়া সে ডাকিল, গোপির মা?

জবাব দিল কপিলা।—গোপির মা ঘুমায়।

কুবের উঠিয়া আসিয়া বলিল, যা তুই ঘুমা গা কপিলা, আমি বইয়া থাকি।

কপিলা চাপা গলায় বলিল, আরে পুরুষ! রাত ভইরা ঘুমাইয়া বিয়ানে কয়, যা তুই ঘুমা গা কপিলা। কাউয়ায় ডাক পাড়ে শুনছ মাঝি?

তাইতো বটে! ফরসা হইয়া আসিয়াছে যে!

ঝাঁপ খুলিয়া কুবের বাহিরে গেল। গণেশের বাড়ি গিয়া ডাকাডাকি করিয়া তুলিল গণেশকে। যুগল কাল বোনের বাড়ি নেমন্তন্ন খাইতে আসিয়া রাত্রে এখানেই ঘুমাইয়াছিল, সে-ও উঠিয়া আসিল। কুবের বলিল, গণেশ, মাইয়ারে ত হাসপাতালে নেওন লাগে, বড়ো কাতর মাইয়া, রাইত্ ভইরা চেঁচাইয়া মরছে।

গণেশ বলিল, হ?—ব কুবির, তামুক খা। হাসপাতালে নেওন ত সহজ কথা না! কিবা নিবি ভাবছস নি?

নাও নিয়া যামু, আবার কিবা?

সমস্যার সমাধানে গণেশ খুশি হইয়া বলিল, তবে চিন্তা নাই, যুগইলার নাওখান মিলব আইজ, নাও নিয়া আইছে যুগইলা।—নাওখান দিবি না যুগইলা তর?

যুগল সাগ্রহে নৌকা দিতে সম্মত হইল। বলিল, সেও সঙ্গে যাইবে। খুব বুঝি ফুলিয়াছে গোপির পা-টা? কোথায় চোট লাগিয়াছে? আগে কেন মেয়েকে হাসপাতালে দেয় নাই কুবের—আগেই লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আজ যদি হাসপাতালে লইতেই হয়, দেরি করিয়া লাভ কী? বেলা হইয়া গেলে হাসপাতালে ডাক্তারকে পাওয়া যাইবে না।

একটা চওড়া কাঠের তক্তায় শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গোপিকে নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইল। কাঁথা বালিশ হাতে করিয়া কপিলা গেল সঙ্গে। ইতিমধ্যে জেলেপাড়ায় খবর রটিয়া গিয়াছিল। গ্রামের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া প্রতিমা বিসর্জনের চেয়ে কম গুরুতর ব্যাপার নয় জেলেপাড়াবাসীদের কাছে—এই ভোরে নদীতীরে একটি ছোটোখাটো ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কুবের একেবারে হয়রান।

কপিলা আগে নৌকায় উঠিয়া কাঁথাপত্র বিছাইয়া দিল, তারপর গোপিকে তুলিয়া শোয়ানো হইল। যন্ত্রণায় ও ভয়ে গোপির মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। হাসপাতাল? না জানি কী ভয়ংকর সেই স্থান! কে জানে সেখানে কী হইবে তাহার! কপিলার একটা হাত গোপি সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

নৌকা খোলা হইবে এমন সময় দেখা গেল রাসু ছুটিয়া আসিতেছে। নদীতীরে পৌঁছিয়া সে লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল।

কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কীরে রাসু?

রাসু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, আমিও যামু।

চলুক! এতবড়ো নৌকা, স্থানাভাব হইবে না। বেশি লোক সঙ্গে থাকিলে গোপিকে উঠানো নামানোর বরং সুবিধাই হইবে।

মহকুমা শহর আমিনবাড়ি, সেইখানে সরকারি হাসপাতাল। কেতুপুর হইতে আমিনবাড়ি বেশি দূর নয়, ঘণ্টা তিনেক লাগিল পৌঁছিতে। রাসুর সাধ ছিল গোপিকে ঘাট হইতে হাসপাতাল পর্যন্ত লইয়া যাইতে সেও কাঁধ দিবে, কিন্তু তার প্রয়োজন হইল না। সকলকে নৌকায় বসিয়া থাকিতে বলিয়া যুগল নামিয়া গেল, খানিক পরে কোথা হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া লইয়া আসিল একটা পালকি। যুগল কি কম পাকা লোক। পালকি চাপিয়া গোপি হাসপাতালে গেল।

হাসপাতালে তখন রোগীর ভিড় জমিয়াছে। একটা ছোটো ছেলের ফোঁড়া অপারেশন করা হইতেছিল, কী তাহার তীব্র চীৎকার। গোপি তো দেখিয়া শুনিয়া বিবর্ণ হইয়া গোঙাইতে আরম্ভ করিল। কুবেরের মুখখানাও শুকাইয়া পাংশু হইয়া গিয়াছে। সকলেই অল্পবিস্তর ভীত ও সন্ত্রস্ত। শুধু অবিচলিত আছে রাসু। ময়নাদ্বীপ হইতে পলাইয়া আসিয়া নোয়াখালির হাসপাতালে সে পনেরোটা দিন কাটাইয়া দিয়াছিল, এ তাহার পরিচিত স্থান। সকলকে সে অভয় দিয়া বলিতে লাগিল, ভয় নাই, ভয় নাই, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

সে-ই গিয়া ডাক্তারকে গোপির অবস্থা বলিয়া নামধাম লিখাইয়া আসিল। কী গর্ব রাসুর! দেখুক কুবের, কেমন চটপটে পাকা লোক সে! দেখিয়া রাখুক!

বেলা প্রায় এগারোটার সময় অবসর করিয়া ডাক্তারবাবু গোপির পা পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিয়া রাগের সীমা রহিল না ডাক্তারের। রাসুই কিনা বুক ঠুকিয়া কথা বলিতেছিল, তাহাকেই গোপির অভিভাবক ঠাওরাইয়া ধমক দিয়া ডাক্তার আর কিছু রাখিলেন না। এতকাল কী করিতেছিল তাহারা, বসিয়া বসিয়া ঘাস কাটিতেছিল? আগে আনিতে পারে নাই গোপিকে? পা যদি এবার কাটিয়া বাদ দিতে হয়?

অপারেশন টেবিলে শুইয়া গোপি কপিলার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল, গোঙাইয়া গোঙাইয়া সে তো কাঁদিতে থাকেই, কপিলাও মৃদু সুর তোলে কান্নার—তারপর ডাক্তারের ধমকে আচমকা স্তব্ধ হইয়া যায়। পরীক্ষা শেষ করিয়া ডাক্তার বড়ো ভয়ানক কথা বলিলেন। এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে গোপিকে। তবে একথাও তিনি বলিলেন যে, রাখা না-রাখা গোপির বাপের খুশি, জোরজবরদস্তি নাই।

হাসপাতালের বারান্দায় পরামর্শ সভা বসিল। ডাক্তারের ধমকে রাসু বড়ো দমিয়া গিয়াছিল, সে আর কথা বলিল না—হয়তো এতক্ষণে গোপির অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া মনটাও তার খারাপ হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। ঘরের মধ্যে গোপি কাঁদিতে লাগিল—আগো মাসি আমি থাকুম না, আমারে নিয়া যাও—আর বাহিরে কুবের গণেশ আর যুগল গম্ভীর মুখে

বলাবলি করিতে লাগিল যে এবার কী করা কর্তব্য। পরামর্শ করা একান্ত মিছে, ডাক্তার যে কথা বলিয়াছে তারপর গোপিকে না রাখিলে চলিবে না এখানে, তবু তারা অজ্ঞ ও ভীরু গ্রামবাসী কিনা, দীর্ঘ পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই তারা করিতে পারে না।

গোপিকে মেয়ে-ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। তারপর আর তাহাদের গোপির কাছে থাকিবার উপায় রহিল না। আবার সেই চারটার সময় আসিয়া মেয়েটার সঙ্গে তাহারা দেখা করিতে পারিবে।

গোপি কপিলাকে কিছুতে ছাড়িবে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, আগো মাসি, নিয়া যাও, কই থুইয়া যাও আমারে?

হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা ফিরিয়া গেল নদীর ঘাটে। পথে কিনিয়া লইল কিছু চিড়ামুড়ি। এত বেলা অবধি কেহ তাহারা কিছু খায় নাই।

নীরবে সকলে জলযোগ শেষ করিল। এবার? কী করিবে তাহারা এবার?

যুগলের থাকিবার উপায় নাই। নৌকা তাহার ভাড়া হইয়া আছে, সকালবেলাই তাহার দেবীগঞ্জে যাওয়ার কথা ছিল। কুবের এখন গ্রামে ফিরিবে তো? গ্রামের ঘাটে সকলকে নামাইয়া দিয়া যুগল সোজা চলিয়া যাইবে দেবীগঞ্জে।

কুবের বলিল, তোমরা যাও, বৈকালে মাইয়াটারে একবার না দেইখা আমি যামু না।

রাসু বলিল, আমিও থাকি, আঁই?

কুবের বলিল, না রাসু, যা গিয়া তুই। কই থাকুম কী বিত্তান্ত ঠিক নাই, তুই থাইকা করবি কী?

গণেশ থাকিতে চাহিল, কুবের তাকেও বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিল। কপিলা অবশ্যই ফিরিয়া যাইবে, তাই তাহার থাকা না থাকার কথাই উঠিল না, কপিলাও কিছু বলিল না। কিন্তু কপিলাই শেষ পর্যন্ত নৌকায় উঠিল না। সেও বিকাল পর্যন্ত এখানে থাকিবে, গোপিকে আর একবার না দেখিয়া গ্রামে কি সে ফিরিতে পারে? আহা, মাসি মাসি বলিয়া মেয়েটা হয়তো কাঁদিয়া মরিতেছে। কেহ তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুবের কত বলিল, নিজে সে কোথায় থাকিবে ঠিক নাই, মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকিলে কত হাঙ্গামা, কত অসুবিধা—তা ছাড়া লোকে বলিবে কী? কপিলা কোনো কথাই কানে তুলিল না।

নৌকা চলিয়া গেল।

কুবের মুখ ফিরাইয়া দেখিল, নদীর বাতাস কপিলাকে স্পষ্ট করিয়াছে, শাড়িখানি মিশিয়া গিয়াছে অঙ্গে। বেগুনি রঙের শাড়িখানি পরিয়াই সে যে আজও পথে বাহির হইয়াছে, এতক্ষণ কুবের তো তাহা লক্ষ করে নাই! এতক্ষণে খেয়াল করিয়া সে যেন কেমন অসন্তোষ বোধ করিল। কপিলাকে লইয়া এখন সে কী করিবে, যাইবে কোথায়? কী মতলব করিয়াছে কপিলা? থাকিবার ওর কী প্রয়োজন ছিল?

কী দ্যাখ মাঝি? কী ভাব? কপিলা বলিল।

জিগানে কাম কী তর? কুবের বলিল।

গোসা কর ক্যান? উই দ্যাখ জাহাজ আহে।

সেইখানে নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহারা চাহিয়া থাকে, চক্রাকারে পাক দিয়া জাহাজ আসিয়া ভিড়ে জেটিতে। কী ভিড় হইয়াছে আজ জাহাজে! আজ পূজা শেষ, আজও দেশ-দেশান্তরের মানুষ গৃহে ফিরিতেছে। আর, কী অদৃষ্ট কুবেরের, মেয়েটাকে আজ এই বিদেশে হাসপাতালে ফেলিয়া রাখিয়া মূঢ়ের মতো সে দাঁড়াইয়া আছে নদীতীরে, কোথায় যাইবে কী করিবে ঠিক নাই! ভোঁ দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া যায়। নদীর আলোড়িত জল ঢেউ তুলিয়া তীরে আছড়াইয়া পড়ে। মেয়েটার জন্য এমনই ঢেউ উঠিয়াছে কুবেরের বুকে।

হঠাৎ কপিলা বলিল, মাঝি, পয়সাকড়ি আনছ?

হ।

কত?

তা দিয়া কী কাম তর?

আমি কিছু আনছি, লাগলে নিও।

কপিলা আঁচলে গেরো বাঁধা পয়সা দেখাইল।

কুবের হাঁ না কিছুই বলিল না। জেটি নির্জন হইয়াছে দেখিয়া খানিক পরে জেটিতে গিয়া ছায়ায় তাহারা বসিয়া রহিল। কুবের তাকায় না কপিলার দিকে, একটার পর একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে থাকে—মিনিটে মিনিটে বিড়ি খাওয়ার মতোই সে যেন বড়োলোক।

ক্যামনে ফিরবা মাঝি? খানিক পরে কপিলা জিজ্ঞাসা করিল।

কেডা জানে? যেমন কাণ্ড তর কপিলা। তরে নিয়া কী যে করুম—

আমার লাইগা ভাইবো না মাঝি।

এতক্ষণে কী মনে করিয়া কুবের হাসিল, বড়ো পোলাপান তুই কপিলা। সোয়ামি শুইনা কী কইব তর ভাবছস নি?

কউক।

তা বইকী! কলঙ্ক কিনিবার সাধ যে কপিলার ষোলো আনা দেখা যায়? কুবের গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। এ তো ভালো কথা নয়। একবাড়িতে যারা বাস করে শুধু দুর্নাম কিনিবার জন্য এখানে তাদের পড়িয়া থাকিবার কোনো মানে হয় না। শুধু গোপির জন্যই কি কপিলা রহিয়া গেল? গোপিকে সে এত ভালোভাসে? কে জানে, কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই।

বেলা পড়িয়া আসিলে দুজনে হাসপাতালে গেল। কুবেরের এবার প্রথম মনে হইল থাকিয়া বুঝি ভালো করিয়াছে কপিলা। এমন করিয়া নতুবা গোপিকে সে নিজে তো সান্ত্বনা দিতে পারিত না কপিলার মতো! তা ছাড়া যে কাণ্ড আজ ডাক্তার করিলেন গোপিকে লইয়া, কপিলা না থাকিলে বুক বাঁধিয়া সেসময় কে থাকিত গোপির কাছে? গোপির হাঁটুর হাড়ই শুধু ভাঙে নাই, মস্ত একটা বাঁশের গোঁজ ঢুকিয়া গিয়াছিল মাংসের মধ্যে, পা ফুলিয়া সেটাকে আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তার এ বেলা সেটা টানিয়া বাহির করিলেন, তারপর ভাঙা হাড়টা যতদূর সম্ভব স্বস্থানে বসাইয়া কোমরের কাছ হইতে পা পর্যন্ত কাঠের তক্তা

বসাইয়া বাঁধিয়া দিলেন ব্যান্ডেজ। কুবের এসব দেখিল না, বাহিরে বসিয়া সে শুধু গোপির আর্তনাদ শুনিল!

দুজনে যখন তাহারা হাসপাতাল হইতে পথে নামিয়া আসিল, সন্ধ্যা হইতে বেশি বাকি নাই। দূরে বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছিল। গ্রামেই এখন তাহাদের ফিরিতে হইবে। এখানে রাত কাটাইবে কোথায়? কাল আবার কুবের আসিয়া গোপিকে দেখিয়া যাইবে। নদীর ঘাটে গিয়া কুবের নৌকায় নৌকায় চেনা মাঝি খুঁজিয়া বেড়াইল। চেনা মাঝি দু-চারজন মিলিল বটে কিন্তু আজ বিজয়ার সন্ধ্যায় নৌকা তো কেহ খুলিবে না! দেবীগঞ্জের দিকে যাদের যাওয়ার দরকার ছিল, দিনে দিনে তারা চলিয়া গিয়াছে। তবে গহনার নৌকা* ছাড়িবে একটা, কুবের ইচ্ছা করিলে ভাড়া দিয়া যাইতে পারে। নতুবা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, যে নৌকাই কেতুপুরের দিকে যাক, কুবের তাহাতে গ্রামে ফিরিতে পারিবে।

কত নাও যাইবো কাইল, পয়সা দিয়া ক্যান যাইবা কুবের বাই? বলিয়া পরিচিত মাঝি কুবেরকে নৌকায় রাত্রি যাপন করিতে অনুরোধ করে। শুধু পরিচিত মাঝি কেন, পদ্মানদীর মাঝি সে, পদ্মানদীর যে-কোনো মাঝির নৌকায় রাত্রিযাপনের অধিকার তার জন্মগত, কিন্তু এখানে রাত কাটানোই যে মুশকিল। কপিলার সঙ্গে একত্র এখানে রাত কাটাইয়া গিয়া কাল গ্রামে সে মুখ দেখাইবে কী করিয়া? কী বিপদেই কপিলা তাহাকে ফেলিয়াছে।

পয়সা দিয়া গহনার নৌকায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। কত ভাড়া লইবে কে জানে! জিজ্ঞাসা করিতে গহনার নৌকার মাঝি বলে, সোনাখালি হইয়া তীরে তীরে তাহারা দেবীগঞ্জ পৌঁছায়, পদ্মা পার হইয়া কুবেরকে কেতুপুরে তাহারা নামাইয়া দিতে পারিবে না। হাসাইলের খাল পর্যন্ত তাহারা এ তীর ঘেঁষিয়া চলিবে, কুবের সেখানে নামিতে পারে, ভাড়া মাথা পিছু তিন আনা।

হাসাইলের খাল হইতে কেতুপুর দু-ক্রোশের কম নয়। এই রাত্রে অতখানি পথ কপিলা হাঁটিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কুবের জিজ্ঞাসা করে, কী করি কপিলা?

কপিলা বলে, না গেলাম আইজ? কাইল বিয়ানে গোপিরে দেইখা মেলা করুম?

থাকুম কই? নায়?

তাই কি হয়! ডাকাত না গুণ্ডা নৌকার মাঝি কে জানে, কপিলা কী পারে এই নদীর ঘাটে খোলা নৌকায় শুইয়া থাকিতে? ওই তো ঘাটের হোটেল দেখা যায়, ওখানে একটা ঘর ভাড়া নেওয়া যাক।

কী আর করিবে কুবের, দরদস্তুর করিয়া ছ-আনায় বড়ো একটা ঘরের একদিকে ছাঁচের বেড়ায় ঘেরা স্থানটুকু ভাড়া করে। দরজা বা ঝাঁপ কিছুই নাই, ঢুকিবার জন্য একটু ফাঁক রাখিয়া ঘেরিয়া দিয়াছে। ঘরের মধ্যে সারি সারি মোটা পাটি পাতা, অতিথিরা রাত্রে শয়ন করিবে—ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে একখানা পাটিতেই মেঝের প্রায় সবটা ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে খোলা চালার নীচে খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘরেও কতকগুলি পিঁড়ি

* গহনার নৌকা—প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ছাড়িয়া বহুদূর অবধি যাত্রী লইয়া যাওয়া আসা করে।

পড়ে, চালাটার মাঝখানে একটা কালি-পড়া লণ্ঠন রাখা হইয়াছে, বাকি সর্বত্র জ্বলিতেছে কেরোসিনের কুপি।

কুবের গিয়া চালার নীচে বসিয়া খাইয়া আসে। চালার বাহিরে সকলের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া খোলা আকাশের নীচে খায় কপিলা। তারপর এক পয়সার পান কিনিয়া আনে কুবের, ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে বসিয়া দুজনে নীরবে পান চিবায়। সারাদিন কত হাঙ্গামা কত হাঁটাহাটি গিয়াছে, দুপুরে স্নান হয় নাই, পেটে ভাত পড়ে নাই, ক্রমে ক্রমে দুজনেরই ঢুল আসিতে থাকে। আর একটু রাত হইলে কুবের উঁকি দিয়া দেখে, কাপড় মুড়ি দিয়া কেহ কেহ পাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে, কোনো পাটিতে বসিয়া কেহ টানিতেছে তামাক।

কুবের উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, শো কপিলা।

তুমি কই যাও?

উই পাটিতে শুই গিয়া আমি, যামু কই?

ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠে কপিলা বলে, না, যাইও না মাঝি।

কুবের কি রাগিয়া যায়? কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করে, কী করুম অবে?

ডরামু মাঝি।

কী আর করিবে কুবের, আবার সে পাটিতে বসে। কপিলা তাহার চাদরখানা পুঁটুলি করিয়া তাহাকে বালিশ করিয়া দেয়। তার নিজের মাথায় দেওয়ার জন্য ছোটো একটি পিঁড়ি আছে। কুবের শুইয়া পড়িলে এতক্ষণে কপিলা চুল খুলিয়া দেয়, আঙুল দিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলে, গোপির লাইগা পেরানডা পোড়ায় মাঝি, স্যায় বুঝি ডরাইয়া কাইন্দা মরে।

বুঝিতে পারা যায় কপিলা কাঁদিতেছে।

কেডা জানে কবে মাইয়া সাইরা উঠ্যা বাড়িত্ যাইব! মাইয়ারে ফেইলা ক্যামনে ফিরুম মাঝি কাইল?

কুবের কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে। এখানে কাঁদিতেছে কপিলা, ওখানে মালাও হয়তো কাঁদিতেছে এখন। পথের দিকে চাহিয়া কত কী হয়তো ভাবিতেছে মালা। আর গোপি কী করিতেছে তা যেন ভাবাও যায় না।

পরদিন ভোরে আগে ঘুম ভাঙিল কপিলার। হাই তুলিয়া সে উঠিয়া বসিল, ঠেলা দিয়া কুবেরকে তুলিয়া দিল। বেড়ার বাহিরে পাটিতে এখনও রাত্রির অতিথিরা নাক ডাকাইতেছে, শুধু বাহিরের দুয়ারের কাছে কেরোসিন কাঠের বাক্সে বসিয়া তামাক টানিতেছে হোটেলের মালিক। রান্নাঘরে দাসী উনানের ছাই তুলিতেছে। কপিলাকে দেখিয়া ঘুমন্ত কুকুরটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

মৃদু মধুর শীত পড়িয়াছে। কুবেরের চাদরখানা পরিয়া কপিলা প্রথমে নদীতে ডুব দিয়া আসিল, তারপর স্নান করিতে গেল কুবের। কুবের ফিরিয়া আসা পর্যন্ত কপিলা ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে লুকাইয়া রহিল। পুরুষের দৃষ্টিপাতে আজ বড়ো লজ্জা করিতেছে কপিলার,

দিনের আলোয় আজ তার মনে হইতেছে জগৎসুদ্ধ সকলেই বুঝি জানে যার পাশে শুইয়া সে রাত কাটাইয়াছে স্বামী সে তাহার নয়।

মুড়ি আর বাতাসা কিনিয়া কুবের ফিরিয়া আসিল। দু মুঠা খাইয়া কপিলা বলিল, আর সে খাইবে না। না খাক, কুবেরের পেটে জায়গা আছে ঢের। ধীরে ধীরে মুড়ি আর বাতাসা শেষ করিয়া সে বলিল, ল, যাই হাসপাতাল।

তখন সবে রোদ উঠিয়াছে। এত সকালে গোপির সঙ্গে তাহারা দেখা করিতে পারিল না। নটা পর্যন্ত হাসপাতালের সামনে বসিয়া থাকিতে হইল। তারপর ঘণ্টাখানেক গোপির কাছে থাকিয়া, তাহাকে অনেক আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়া ঘাটে ফিরিয়া আসিল। জহরের শালা নুরুলের নৌকা কাঠের বোঝা নামাইয়া দেবীগঞ্জ ফিরিয়া যাইতেছিল, সেই নৌকায় তাহারা উঠিয়া বসিল।

গ্রামের ঘাটে নামিয়া কুবের বলিল, বাড়িত্ যা কপিলা, আমি গণেশের লগে দেখা কইরা যাই।

বাড়িতে যদি ঝড়ঝাপটা ক্রন্দন ঘনাইয়া থাকে প্রথম ধাক্কাটা কপিলার উপর দিয়াই যাক! কপিলা কিন্তু একা বাড়ি যাইতে রাজি হইল না, রুখিয়া বলিল, আরে পুরুষ!

তখন আর কথাটি না বলিয়া কুবের হনহন করিয়া বাড়ির দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। কপিলা পিছাইয়া পড়িল। পথে যার সঙ্গে দেখা হইল সে-ই সাগ্রহে গোপির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, চাপাহাসি-ঢাকা পরিহাস রূঢ় ইঙ্গিত কিছুই কারও কাছে জুটিল না কুবেরের। এত কী সুনাম সে রাখিয়া গিয়াছিল গ্রামে যে কপিলার সঙ্গে একটা পুরা রাত্রি অজানা স্থানে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াও সে সুনাম নিটোল অক্ষত দেখিতে পাইতেছে? ব্যাপারখানা কী? চলিতে চলিতে হঠাৎ কুবেরের মনে পড়ে, দুজন তো নয়, গোপিকে ধরিলে তারা যে তিনজন! গ্রামের লোক তাকে আর কপিলাকে হোটেলের চাঁচের বেড়ার নির্জনতায় পৃথকভাবে কল্পনা করে নাই, তাহাদের সঙ্গে গোপিকেও একত্র চিন্তা করিয়াছে। কারও মনে তাই সন্দেহ জাগিবার অবকাশ থাকে নাই।

কুবের দাঁড়াইল। কপিলা কাছে আসিলে বলিল, দ্যাখ্ কপিলা, জিগাইলে কইস রাইতে হাসপাতালে ছিলাম, গোপির কাছে।

কপিলা মাথা নাড়িয়া বলিল, দূর অ? মিছা কথা আমি কই না মাঝি!

বলিয়া খানিক আগে কুবের যেমন করিয়াছিল তেমনি হনহন করিয়া কপিলা আগাইয়া গেল।

কে জানে কী আছে কপিলার মনে। বারণ না মানিয়া কাল ও আমিনবাড়িতে থাকিয়া গেল, আজ বারণ না মানিয়া সত্য কথা বলিতে চায়। বলুক! পুরুষ মানুষ কুবের, কী ভয় তার? কপিলার সত্যবাদিতার ফল যদি কেহ ভোগে ভুগিবে কপিলাই!

বাড়ি গিয়া কুবের দেখিল, মালার কাছে কপিলা সবিস্তারে আমিনবাড়ির কাহিনি বলিতেছে। কাছে চাটাইটার উপর সে বসিয়া পড়িল। মালাকে সবই বলিবে নাকি কপিলা, হোটেলে রাত্রিযাপনের কথা পর্যন্ত? কপিলা বলিয়া যায়—সন্ধ্যাবেলায় কী বিপদেই তারা

পড়িল। হাসপাতালে থাকিতে দিল না, ফিরিবার নৌকা পাওয়া গেল না, কোথায় যায়? শেষে এক মোক্তারবাবু দয়া করিয়া তাদের আশ্রয় দিলেন।—কী নাম য্যান মাঝি মুক্তারবাবুর? মুখ ফিরাইয়া কপিলা জিজ্ঞাসা করিল কুবেরকে।

কুবের থতোমতো খাইয়া বলিল, কেডা জানে?

জিগাও নাই?

কুবের মাথা নাড়িল।

দুদিনের মধ্যে আর গোপিকে দেখিতে যাওয়া হইল না। জীবিকা অর্জন করিতেই কুবের ব্যস্ত হইয়া রহিল। পরের দিন সকালে মালা ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। আই গো কুবেরের পাষাণ প্রাণ! মেয়েটাকে সে যে কোথায় রাখিয়া আসিল, আর কি তাহার খবর লইতে হইবে না! জন্মের মতো রাখিয়া দিয়া আসিয়াছে নাকি মেয়েকে, এমন যে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে কুবের?

সারারাত মাছ ধরিয়া কুবের তখন বাড়ি ফিরিয়াছে। ভাত খাইয়া দুপুরবেলা আমিনবাড়ি রওনা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া সে মালাকে শান্ত করিল, তারপর ঘুমাইতে গেল পিসির ঘরে। ঘুমাইয়া উঠিয়া স্নান করিয়া আসা অবধি সে আড়চোখে চাহিতে লাগিল কপিলার দিকে। কে জানে কপিলা আজ সঙ্গে যাইতে চাহিবে কি না! কপিলা কিছু বলে না, একবার সামনে আসে একবার অন্তর্হিত হয়।

খাইতে বসিয়া কুবের বলে, খাইয়া উঠ্যাই আমিনবাড়ি রওনা দিমু কপিলা।

ফিরবা না আইজ?

কেডা জানে। হয়তো হোটেলে থাকুম।

হোটেলে ক্যান? থাইকো, মুক্তারবাবুগো বাড়ি থাইকো।

বলিয়া কপিলা হাসে। লজ্জা পাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া কুবের খাইয়া যায়। না, কপিলার মনের হদিস পাইবার ভরসা তাহার আর নাই। কখন কী বলিবে, কখন কী করিবে, কিছুই অনুমান করিতে পারা যায় না।

খাইয়া উঠিয়া কুবের ময়লা চাদরটি গায়ে জড়াইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। বড়ো সে গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, যেন এমন একটা অপমান সম্প্রতি তাহার জুটিয়াছে যাহা তাহার প্রাপ্য নয়। বড়ো নির্মম কপিলা, বড়ো দুর্বোধ্য তাহার ব্যবহার।

রওনা হওয়ার সময় কুবেরকে চার আনা পয়সা দিয়া কপিলা বলিল, গোপিরে ফল কিনা দিবা মাঝি। তারপর মালাকে বলিল, মাঝির লগে যামু নাকি দিদি?

মালা বলিল, তর গিয়া কাম কী?

তখন কপিলা বিষণ্ণভাবে একটু হাসিল, কুবেরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাঝি কী কও?

কুবের মাথা নাড়িল, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। আমিনবাড়ি সে পৌঁছিল অপরাহ্নে, কপিলার পয়সা দিয়া স্টিমারঘাট হইতে কমলালেবু কিনিয়া গোপিকে দেখিতে গেল, নদীতীরে ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যাবেলা। আজ বাড়ি ফিরিবার নৌকার অভাব নাই, তবু কুবেরের

কেন যেন ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, অনেক রাত্রি অবধি নদীতীরে বসিয়া থাকিয়া সে হোটেলে ভাত খাইতে গেল। খাইতে খাইতে সে শুনিতে পাইল বাজারে আজ ভাসান-যাত্রা হইতেছে। আজ কুবের কাছে না থাকিলে কেহ ভয় পাইবে না, খাইয়া উঠিয়া সে বাজারের দিকে পা বাড়াইল।

বাজারে টিনের চালার নীচে যেখানে তরিতরকারির দোকান বসে সেইখানে যাত্রার আসর বসিয়াছে, লোক জমিয়াছে ঢের। কুবের একপাশে বসিয়া পড়িল। পানবিড়ির দোকান ছাড়া এত রাত্রে পসরা সাজাইয়া কেহ নাই, রূপ-কন্যারাও যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। পেশাদার দল নয়, আলু-বেচা তেল-বেচা মানুষের শখের দল, অনেকে হয়তো পড়িতেও জানে না, একে ওকে দিয়া পড়াইয়া শুনিয়া শুনিয়া পার্ট মুখস্থ করিয়াছে, শক্ত শক্ত অনেক শব্দই উচ্চারণ হয় না, তাই হাস্যকর রকমে ভাঙিয়া জিহ্বার উপযোগী করিয়া নিয়াছে—বক্তৃতাগুলি কথ্য ও শুদ্ধ ভাষার এক অপরূপ খিচুড়ি। পোশাক পরিচ্ছদের যেমন অভাব, অভিনেতা নির্বাচনে কাণ্ডজ্ঞানেরও তেমনই অভাব। বালক লখিন্দরের পাশে তার চেয়ে একহাত বেশি লম্বা বেহুলা নির্বিকারচিত্তে পার্ট বলে—গলাটি মিহি বলিয়া আর চমৎকার মেয়েলি ঢঙে অভিনয় করিতে পারে বলিয়া ওকে বেহুলা করা হইয়াছে, আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।

তবু রাত জাগিয়া ভিড় করিয়া সকলে ভাসান-যাত্রা শোনে, একবার নয় বহুবার। ভাঙা হারমোনিয়াম আর ঢ্যাপসা তবলার সঙ্গত, মশালের লাল আলো, আলু-বেচা তেল-বেচা অভিনেতা—তবু কী মোহ এ যাত্রার! কুবের ঠায় বসিয়া থাকে। ঢিমাইয়া ঢিমাইয়া অভিনয় চলে, মা মনসা একটা গান করেন, চাঁদ সদাগর দুটো কথা বলে, মৃত লখিন্দর উঠিয়া একটা গান করিয়া আবার মরিয়া যায়। কোথায় কখন কোন দৃশ্যের শুরু, সর্পদষ্ট লখিন্দরের জন্য বেহুলার বহুল বিলাপের পর মা মনসা আবার কেন গান গাহিয়া গাহিয়া চাঁদ সদাগরকে ভয় দেখাইয়া যান যে তাকে পূজা না করিলে লখিন্দরকে সাপে কাটিবে, এসব বুঝিবার দরকার হয় না। কুবের মন দিয়া যাত্রা শোনে। রাত্রি শেষ করিয়া যাত্রা শেষ হইলে পেঁয়াজের যে খালি বস্তাটার উপর সে এতক্ষণ বসিয়া ছিল তার উপরেই কাত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমানোর সুযোগ সে পায় না। সকাল হইতে না হইতে তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দেওয়া হয়। সেখানে এবার দোকান বসিবে।

অনেক বেলায় সে গ্রামে ফেরে। দেখিতে পায় বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে। কপিলার স্বামী শ্যামাদাস!

লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ, ঘাড়-ছোঁয়া বাবরি চুল মাথায়, বোঁচা নাকটার নীচে একজোড়া উদ্ধত গোঁফ—খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় বিশ্বজগতে কারো সে তোয়াক্কা রাখে না। কুবেরের মুখখানা ম্লান হইয়া যায়। কে জানে কেন আসিয়াছে শ্যামাদাস!

শ্যামাদাসের আসিবার উদ্দেশ্য জানিতে বেশি দেরি হইল না। এ পক্ষের বউটা তাহার মরিয়া গিয়াছে। কপিলাকে সে নিয়া যাইবে। কখন যাইবে? বেলা পড়িয়া আসিলে একসময়

রওনা হওয়া যাইবে, সেজন্য কী! কুবের যদি খাতির করিয়া একটা দিন থাকিয়া যাইতে বলে তাতেও শ্যামাদাসের আপত্তি নাই।

বসিয়া বসিয়া তাহারা কথাবার্তা বলে, কপিলা একসময় আসিয়া ফিসফিস করিয়া স্বামীর কানে কানে কী যেন সব গোপনে কথা বলে, তারপর হাসিয়া চলিয়া যায়, পিসির ঘরে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া চোখের একটা দুর্বোধ্য ইঙ্গিতও করে।

এত বেলায় কুবের ফিরিয়া আসিয়াছে, কই খাওয়ার কথা কপিলা তো কিছু বলিল না? কুবেরের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে রাখিবার প্রয়োজন কী কপিলার ফুরাইয়া গিয়াছে? গোপির কথাও তো কিছু সে জিজ্ঞাসা করিল না?

গায়ের চামড়াটা কুবেরের আজ বড়ো খসখস করিতেছিল, অনেকদিন তেল মাখা হয় নাই। শ্যামাদাস আসিয়াছে বলিয়াই কপিলা বোধহয় আজ চুলে আবার জবজবে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে। কালো একটি বোতলে বিলাসিতার এই উপকরণটি কপিলা সর্বদা মজুত রাখে, একটা কিছু উপলক্ষ পাইলেই বোতলটা কাত করে মাথায়। শ্যামাদাসকে বসিতে বলিয়া কুবের কপিলার কাছে একটু তেল চাহিল। কপিলা করিল কী, রাঁধিবার তেল-রাখা বাঁশের পাত্রটি আনিয়া বলিল, ধর মাঝি, হাত পাত। কুবের হাত পাতিলে পাত্রটা সে একেবারে উপুড় করিয়া ধরিল, এক ফোঁটা তেলও কুবেরের হাতে পড়িল না।

কপিলা বলিল, আই গো আই, ত্যাল তো নাই!

বলিয়া কী হাসি কপিলার!

কুবের কথাটি বলিল না, বাঁশের পাত্রটি তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া এই দুপুরবেলা অভুক্ত অবস্থায় গ্রামের ভিতরে গিয়া দু পয়সার তেল কিনিয়া আনিল। কপিলাকে দেখাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সর্বাঙ্গে ঘষিয়া ঘষিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেল মাখিল, নিজের দেহটিকে সে যেন কপিলার চুলের মতোই তেলে জবজবে করিয়া ছাড়িবে।

সারাদিন কপিলার সঙ্গে সে কথা বলিল না।

কিন্তু সন্ধ্যার পর মাছ ধরিতে যাওয়ার সময় তামাকের গোলাটা সঙ্গে লইতে ভুলিয়া গেল। নৌকায় গিয়া একা সে বসিয়া রহিল প্রতীক্ষায়, একসময় গণেশ ও ধনঞ্জয় আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিল, তারপর মৃদু জ্যোৎস্নায় পদ্মার রহস্যময় বুকে নৌকা ভাসিয়া গেল, কিন্তু তামাক পৌঁছাইয়া দিতে কেহ আসিল না।

পরদিন কপিলাকে সঙ্গে করিয়া শ্যামাদাস চলিয়া গেল।

৭

ইলিশের মরসুম শেষ হইয়া গেল। ধনঞ্জয়ের তিনটি নৌকা ইলিশ মাছ ধরার কাজে লাগানো হইয়াছিল। একটিতে থাকিত সে নিজে অন্য দুটিতে তার দুই ছেলে। আশ্বিনের ঝড়ে একটি নৌকা ভাঙিয়া গিয়াছে। এবার একটি নৌকা সে রাখিল মাছ ধরার জন্য, অন্যটি

লাগানো হইল ভাড়া খাটিবার কাজে। ছেলেরা মাছ ধরিবে, নিজে সে একজন মাঝিকে লইয়া নৌকা বাহিবে।

কুবেরকে ধনঞ্জয় পছন্দ করে না। গণেশকে সে তার নৌকার মাঝি হইতে বলিল। কিন্তু গণেশ কিনা বোকা, সে গেল পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে কুবেরের কাছে!

কুবের রাগিয়া বলিল, যা যা, খাট গিয়া আজান খুড়ার নায়। আমারে জিগাস ক্যান? আজান খুড়া বেশি আপনার না তর?

কুবের অনুমোদন না করিলে তাহা হইবার নয়। গণেশ ধনঞ্জয়কে বলিয়া আসিল তার নৌকায় একা সে মাঝির কাজ করিবে না, কুবের যদি করে তবেই সে করিবে, নতুবা নয়। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলিল, যা মর গিয়া তবে। পঞ্চাশজনা মাঝি রাখুম, কলের জাহাজ পাইছস, না?

গণেশ তাহা জানে না। চিরদিন সে কুবেরের কথায় নির্ভর করিয়া আসিয়াছে, কলের জাহাজ হোক আর ছোটো পানসি হোক, কুবের যেখানে নাই গণেশও নাই সেখানে। কুবেরের দাওয়ায় বসিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে লাগিল, আর কুবের গম্ভীর চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল, এবার কী করিবে। মাঝিগিরিই সে করিবে সন্দেহ নাই, তবু গম্ভীর চিন্তিত মুখে অন্য কিছু করা যায় কিনা ভাবিতে কুবের চিরদিন বড়ো ভালোবাসে। কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে কুবেরের অভাব বাড়িয়াছে। ঘরের লক্ষ্মী যেন চলিয়া গিয়াছে কপিলার সঙ্গে, পরিপূর্ণভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি আর হইতেছে না। সময়টা পর্যন্ত পড়িয়াছে খারাপ। জিনিসপত্রের দাম চড়িয়া গিয়াছে। বর্ষায় একটা ফসল নষ্ট হইয়াছিল, পাটের কল্যাণে আমন ধানের ফসলও হইয়াছে কম। চাষিদের ঘরে ধান নাই, টাকা নাই, আছে পাট— কুবেরের ঘরে কিছুই নাই। পাটের উপর চাষির অনিশ্চিত মরণ বাঁচন, কুবেরের জীবনধারণ সুনিশ্চিত মাঝিগিরিতে—সেটা ভালোমতো জুটিতেছে না। একটা নৌকা যদি কুবেরের থাকিত! পদ্মার ঘাটে ঘাটে তবে সে কুড়াইয়া বেড়াইতে পারিত জীবিকা, পরের নৌকায় লগি ঠেলিতে পাইবার ভরসায় বসিয়া থাকিতে হইত না।

ভোরবেলা এখন নদীর বুক জুড়িয়া থাকে কার্তিকের কুয়াশা, যদিও অগ্রহায়ণ আসিয়া গিয়াছে। জলের তল হইতে মাঠঘাট মাথা তুলিয়াছে। কোথাও রবিশস্যের চারা উঁকি দিয়াছে, কোথাও সবে শস্য-বীজ বপন করা হইতেছে। রাত্রে অল্প অল্প শীত করে, কাপড় গায়ে দিতে হয়।

কুবেরের মন বড়ো খারাপ। কিছু ভালো লাগে না। গোপি হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ভাঙা হাঁটুটি তাহার শক্ত হইয়া গিয়াছে, সে হাঁটিতে পারে না। ভবিষ্যতে আবার কোথায় হাড় ভাঙিয়া ঠিক করিয়া দিলে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হয়তো সে হাঁটিতে পারিবে, চলন তার স্বাভাবিক হইবে না কোনোদিন। যুগলকে জামাই করার আশা আর নাই। মেয়ের বিবাহ দিবার এবং সে উপলক্ষে কিছু টাকা পাইবার ভরসাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কী উপায় হইবে গোপির?

রাসু মাঝে মাঝে আসে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, গোপির অবস্থা দেখিয়া সে বড়োই দুঃখিত হইয়াছে। গোপির হাঁটুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডাক্তার কী বলিয়াছে রাসু খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করে, এক একদিন টিপিয়া টুপিয়া নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যায়, কী সন্তর্পণে সে যে স্পর্শ করে গোপির হাঁটু!

মালা হঠাৎ রাসুকে বড়ো খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুগল অবস্থাপন্ন লোক, গোপির দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিবে না, চালচুলাহীন রাসু হয়তো গোপিকে গ্রহণ করিতে পারে।

বড়ো দোটানায় পড়িয়াছে রাসু। আজ সে চাহিলেই গোপিকে পায়, এক পয়সা পণও তাহাকে দিতে হইবে না—কিন্তু সে কি এই গোপিকে চাহিয়াছিল, এই পঙ্গু মেয়েটাকে? খোঁড়া মালাকে লইয়া কুবের সংসার পাতিয়াছে, অসুখী কুবের নয়, দারিদ্র্যের পীড়নে সে কষ্ট পায় বটে কিন্তু পরিবারিক জীবনটি তাহার কামনা করিবার মতো—গোপিকে লইয়া হয়তো সে এমনি সুখের সংসারই পাতিয়া বসিতে পারিবে। তবু মনটা খুঁতখুঁত করে রাসুর। খোঁড়া বউ! হয়তো জীবনে কোনোদিন সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না—যদি পারেও, লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিবে, পায়ের পঙ্গুত্বের জন্য দেহের হয়তো তাহার পুষ্টি হইবে না, চিরকাল কুৎসিত দেখাইবে তাহাকে।

শেষ পর্যন্ত গোপির পায়ের অবস্থাটা কী দাঁড়ায় দেখিয়া কর্তব্য নির্ণয় করার জন্য প্রতীক্ষা করাও বিপজ্জনক। হাসপাতালের ডাক্তার যদি পা-টিকে ঠিক আগের মতো করিয়া দেয়? মরা মানুষ বাঁচায় ডাক্তার, কত ওষুধ, কত যন্ত্রপাতি ডাক্তারের, একটা ভাঙা পা ঠিক করিয়া দেওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়। তখন রাসুকে কি কুবের জামাই করিতে চাহিবে? আপশোশ করিয়া মরিতে হইবে রাসুকে তখন।

সাইরা যাইব কয় নাই ডাকতর? রাসু জিজ্ঞাসা করে।

হ। কুবের জবাব দেয়।

কিন্তু একথা রাসু বিশ্বাস করিতে পারে না। গোপির পা যে কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হইয়া যাইবে রাসুকে তাহা বিশ্বাস করাইতে এত বেশি আগ্রহ দেখায় কুবের যে রাসু সন্দিগ্ধ হইয়া ওঠে।

হঠাৎ একদিন সে করে কী, চলিয়া যায় আমিনবাড়ি। হাসপাতালে গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে, বলে যে সে গোপির আত্মীয়—কোনোমতেই কি গোপির পা-টি আগের মতো করিয়া দেওয়া যায় না? ডাক্তারের সামনে হাতজোড় করিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। কত ব্যাকুল, কত উৎকণ্ঠিত আত্মীয় সে গোপির!

না, গোপির দরদী আত্মীয়কে ভরসা ডাক্তার দিতে পারেন না।

রাসু চিন্তিত মুখে গ্রামে ফিরিয়া আসে। আবার সে দেখিতে যায় গোপিকে। শীতের কুয়াশার মতো ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে মেয়েটা, শীর্ণ রোগা মুখখানাতে জ্বলজ্বল করিতেছে

দুটা চোখ, একটা খড়ের পুঁটুলির উপর ভাঙা পা-টি রাখিয়া এলাইয়া পড়িয়া আছে বিছানায়।

রাসু মমতা বোধ করে। ময়নাদ্বীপে একে একে স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়া যে নিষ্ঠুর বেদনায় বুক তাহার দীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তেমন বেদনা লক্ষ স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়াও আর সে কোনোদিন অনুভব করিবে না—গোপির ভাঙা পা-খানা দেখিলে মনটা শুধু কেমন করিয়া ওঠে।

একদিন সকালে হোসেন মিয়া কুবেরের বাড়ি আসিল।

মৃদু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাম মিলে নাই কুবের বাই?

কুবের মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

হোসেন বলিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, ক্যামনে ভালা করুম তোমাগো হুঁশ থুই কুবের বাই। কাম করবা, আমার লায়?

মনে মনে কুবের ভয় পাইল। কী মতলব করিয়াছে হোসেন মিয়া? যাচিয়া কাজ দিতে চায় কেন? হোসেন মিয়ার উপকার গ্রহণ করিলে শেষ পর্যন্ত মঙ্গল নাই কুবের তাহা ভালো করিয়াই জানে, কোন স্বার্থ সাধিবার জন্য কবে কাকে হোসেন মিয়ার প্রয়োজন হয় তাই শুধু কেহ জানিতে পারে না। কুবের একবার ভাবিল, না, হোসেন মিয়ার নৌকায় সে কাজ করিবে না। কিন্তু একথা বলা যায় না। লোকটার মৃদু হাসি-ভরা মুখের দিকে চাহিয়া যত ভয় করে কুবেরের, সেই ভয়ের তাড়নাতে ওকেই যেন জড়াইয়া ধরিবার প্রয়োজন তত বাড়ে। তা ছাড়া, আজ পর্যন্ত ক্ষতি সে কিছুই তাহার করে নাই, বরং উপকার করিয়াছে অনেক।

কুবের জোর করিয়া আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ পাইলে সে বর্তিয়া যায়। সে যেন জানিত না কুবের রাজি হইবে, এমনিভাবে হোসেন খুশি হইয়া গেল—মানুষ বশ করার কত কায়দাই লোকটা জানে! কী কাজ করিতে হইবে কুবেরকে, কী সে পাইবে এসব কথা কিছুই উঠিল না। হোসেন শুধু বলিল, মাঝে মাঝে দশ পনেরো দিনের জন্য কুবেরকে বাড়িঘর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, যাইতে হইবে পদ্মার দূরতম বন্দরে, যেখানে যেখানে হোসেন মিয়ার বাণিজ্য আছে। কিসের বাণিজ্য হোসেন মিয়ার? কে তা জানে! কে সে প্রশ্ন করিবে? কুবের শুধু সায় দিয়া গেল—তার আপত্তি নাই। সপরিবারে ময়নাদ্বীপ যাওয়া ছাড়া যেখানে যাইতে বলুক, কুবের সেইখানে যাইবে, যা করিতে বলুক তাই করিবে, প্রতিদানে জীবিকা পাইলেই হইল।

গণেশের কথাটা কুবেরের মনে পড়িতেছিল, তার জন্য ধনঞ্জয়ের নৌকায় একা সে কাজ নেয় নাই। আজ গণেশকে ফেলিয়া হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেওয়া তার কি উচিত হইবে? কুবের উশখুশ করে। গণেশের কথাটা বলিতে গিয়া মুখে আটকাইয়া যায়। বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে গিয়া যদি তার নিজের কাজটা ফসকাইয়া যায়? তা ছাড়া তার সঙ্গে

গণেশও হোসেন মিয়ার খপ্পরে আসিয়া পড়িবে এটা কুবেরের ভালো লাগিতেছিল না।

তবু, গণেশেরও একটা উপায় হওয়া চাই।

ঢোঁক গিলিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, গণেশকে নিতে পারে না হোসেন মিয়া? গণেশ বলবান, পাকা মাঝি গণেশ—বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা বটে কিন্তু জেলেপাড়ায় ওর মতো লগি ঠেলিতে, দাঁড় টানিতে আর কেহ পারে না।

হোসেন বলিল, ডাইকা আনবা গণেশরে?

অখন?

হ, যাও বাতচিত কইরা যাই।

কুবের অনিচ্ছার সঙ্গে উঠিয়া গেল। হোসেন মিয়াকে একা বাড়িতে রাখিয়া যাইতে তার ভরসা হয় না। গণেশকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া আমিনুদ্দি আসিয়া হোসেন মিয়ার কাছে বসিয়াছে। আমিনুদ্দিকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। কয়েকদিন আগে জহরের ছেলের সঙ্গে মেয়েটার সে বিবাহ দিয়াছে, স্ত্রীপুত্রের অপমৃত্যুর পর এত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ দিতে সকলে তাহাকে বারণ করিয়াছিল, কারো কথা সে শোনে নাই। যেটুকু বন্ধন ছিল তাও সে অধীর হইয়া চুকাইয়া ফেলিয়াছে। এবার সে কী করিবে সেই জানে!

কুবেরকে দেখিয়া আমিনুদ্দি বলিল, ময়নাদ্বীপি যামু গিয়া কুবির, কাইজা মনে থুইও না, কসুর মাপ কইরো বাই।

ময়নাদ্বীপি যাবা? ক্যান?

কই যামু, না তো?

কুবের ও গণেশ অভিভূত হইয়া আমিনুদ্দির দিকে চাহিয়া রইল। সকলকে হারাইয়া রাসু একদিন ময়নাদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, এখানে সকলকে হারাইয়া আমিনুদ্দি আজ ময়নাদ্বীপে যাইতেছে। আমিনুদ্দিকে ওখানে নেওয়ার জন্য হোসেন অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিল, এতদিনে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল—হোসেনের কোনো ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাকিবার নয়? ভয়ে তাহারা হোসেন মিয়ার দিকে তাকাইতে পারে না। মনে হয় আশ্বিনের ঝড় নয়, হোসেন মিয়াই আম গাছ ফেলিয়া আমিনুদ্দির কুটিরখানি চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। লোকে যে বলে কোনো কোনো মানুষের ভূত-প্রেতের ওপর কর্তৃত্ব থাকে, হোসেনেরও তাই আছে কিনা কে জানে! একদিন রাত্রে সে যে হোসেন মিয়ার পকেট হইতে পয়সা চুরি করিয়াছিল সেকথা মনে করিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে থাকে। এমন অলৌকিক শক্তি যার, সে কি টের পায় নাই চুরির কথা? ঘরের চালা হয়তো নয়, হয়তো হোসেনের পোষ-মানা অন্ধকারের অশরীরী শক্তি সেদিন গোপির হাঁটু ভাঙিয়া দিয়াছিল, বাড়ি ছিল না বলিয়াই কুবের সেদিন বাঁচিয়া গিয়াছিল নিজে? মেঘলা অমাবস্যার অন্ধকারের মতো অতল কুসংস্কার নাড়া খাইয়া কিছুক্ষণের জন্য কুবেরের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

খানিক পরে আমিনুদ্দি উঠিয়া গেল। তখন হোসেন কুবের ও গণেশকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, ময়নাদ্বীপে গিয়া মঙ্গলই হইবে আমিনুদ্দির, এখানে শোকে দুঃখে কাতর হইয়া থাকিবে লোকটা, তার চেয়ে সেখানে গিয়া আবার বিবাহাদি করিয়া ঘর-সংসার করা কি ভালো হইবে না ওর পক্ষে? ময়নাদ্বীপ কি সেরকম আছে এখন, জঙ্গল সাফ হইয়া এখন সেখানে নগর বসিয়াছে।

হোসেন মিয়া চলিয়া গেলে গণেশ ও কুবের বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। ভবিষ্যতের সব জল্পনা-কল্পনা। চাকরি পাইয়া দুজনেই খুশি হইয়াছে, দেনাপাওনার ব্যাপারে হোসেন মিয়া কৃপণ নয়, কোথায় কোথায় যাইতে হইবে, লগি ঠেলা ছাড়া আর কী তাদের দিয়া হোসেন মিয়া করাইয়া লইবে, এখন তাই শুধু তাদের ভাবনা।

কয়েকদিন পরে হোসেন মিয়ার আহ্বান আসিল।

কুবের ও গণেশ সকাল সকাল খাইয়া নদীর ঘাটে গেল। ঘাটে হোসেন মিয়ার বড়ো একটি পানসি বাঁধা ছিল। নৌকায় আরও দুজন মাঝি আছে, তারাও হিন্দু। হোসেন মিয়ার ব্যবস্থা ভালো, একই নৌকায় হিন্দু-মুসলমান মাঝি থাকিলে তাহাদের রান্না-খাওয়ার অসুবিধা হয়, সে তাই তার তিনটি নৌকার দুটিতে শুধু মুসলমান মাঝিই রাখিয়াছে আর এই নৌকাটিতে রাখিয়াছে হিন্দু মাঝি। অন্য মাঝি দুজনের নাম শম্ভু ও বগা।

তখন নদীতে কিছু কিছু কুয়াশা ছিল। সকলকে দাঁড় ধরিতে বলিয়া হোসেন নিজে হাল ধরিয়া বসিল। নৌকা চলিল দেবীগঞ্জের দিকে। দেবীগঞ্জে হোসেন নামিয়া গেল। ঘন্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কুবেরকে সে ডাকিল কাছে। বলিল, কলিকাতা হইতে বিড়ি চালান আসিয়াছে, নৌকায় আমিনবাড়ি পৌঁছিয়া দিতে হইবে। সেখানে গিরিধারী সাহার গদিতে খবর দিলে তাহারা মাল নামাইয়া লইয়া যাইবে, তারপর কুবের নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিবে কেতুপুরে। দ্বিতীয় আদেশ পাওয়া পর্যন্ত নৌকা কেতুপুরে বাঁধা থাকিবে।

সকলকে সঙ্গে করিয়া হোসেন রেলের মালগুদামে গেল। টাকা দিয়া মাল খালাস করিয়া আর সে কথা বলিল না, কুবেরের হাতে তিনটি টাকা দিয়া জেটিতে যে স্টিমারটি বাঁধা ছিল সোজাসুজি তাহাতে গিয়া উঠিল।

হোসেন মুখে বলিয়া যায় নাই, তবু কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে নাই যে সমস্ত ভার সে দিয়া গিয়াছে কুবেরকে, কুবেরই সব ব্যবস্থা করিবে। কুবের প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এ কী সম্মান তার, এ কী সৌভাগ্য! এতবড়ো একটা নৌকা, তিনজন জবরদস্ত মাঝি, তিনশ চারশ টাকার মাল—এ সমস্তের উপর কর্তৃত্বের অধিকার তাহার একার। সকলের রাহাখরচের টাকা পর্যন্ত হোসেন মিয়া তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছে!

মাল তুলিতে বলিতে গিয়া কুবেরের মুখে কথা আটকাইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে সে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল। হোসেন মিয়ার পক্ষপাতিত্বে না জানি মনে মনে ওরা কত রাগিয়াছে!

তারপর কুবের নীরবে একটা প্যাকিং কেস তুলিয়া লইল। শম্ভু জিজ্ঞাসা করিল, জলপানি দিবা না কুবির?

কুবের ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, মাল নায় তুইলা দিলে চলব না?

তা চলিবে। ধীরে সুস্থে তাহারা বিড়ির কেসগুলি নৌকায় তুলিতে লাগিল। কাজে কারো যেন গা নাই। কাজের চেয়ে কথা বলিয়া কুবেরের সঙ্গে খাতির জমাইবার চেষ্টাই তাদের বেশি। একপ্রস্থ মাল রাখিয়া আসিয়াই বগা কুবেরের কাছে একটা বিড়ি দাবি করিয়া বসিল। ওদের দেখাদেখি গণেশও যেন গা ছাড়িয়া দিয়াছে। কুবের মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

মাল বোঝাই হইলে কুবের চিড়াগুড় কিনিয়া দিল সকলকে, বসিয়া বসিয়া এত আরামে তাহারা চিড়া চিবাইতে লাগিল যেন আজকের মতো কাজকর্ম সব শেষ হইয়া গিয়াছে। নৌকা খুলিবার পরেও তাদের শৈথিল্য ঘুচিল না। এমনভাবে দাঁড় টানিতে লাগিল যেন কতকাল আগে তারা মরিয়া গিয়াছে।

কুবের বলিল, গাও লাগাও বাই, জোরে খ্যাপ মার।

শম্ভু বলিল, ক্যান?

কুবের সাহস করিয়া বলিল, ক্যান কী? সারাদিন লাগাইবা আমিনবাড়ি যাওনে? হোসেন মিয়া শুইনা কইব কী?

শম্ভু বলিল, হোসেন মিয়া শুনব ক্যান?

বলিয়া শম্ভু হাসিল। দাঁড় উঁচু করিয়া রাখিয়া বুক চিতাইয়া বলিল, ডরাও নাকি হোসেন মিয়ারে কুবির, আঁই?

কুবেরের পরিচয় এতক্ষণ ওরা পাইয়া গিয়াছে, সর্দার বলিয়া আর মানিবে না, বন্ধুর মতো সমানভাবে কথা কহিবে। কুবের বড়ো বিমর্ষ হইয়া যায়। কত বড়ো পদটা হোসেন মিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে সে তার পদমর্যাদা হারাইয়া বসিল! প্রথম প্রথম যখন ওরা খাতির করিয়া ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তখন একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিলে ভালো হইত। গণেশটা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার সঙ্গে ইয়ার্কি জুড়িয়া দিয়াছে।

কড়া কথা বলিবে নাকি? ভয় দেখাইবে? ওরা অবশ্য চটিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কী আসিয়া যায় তার! স্বয়ং হোসেন মিয়ার সে নির্বাচিত প্রতিনিধি! তবু জোর করিয়া কুবের কিছু বলিতে পারে না। যেটুকু সে বলে সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, নৌকা অগ্রসর হয় মন্থরগতিতে।

আমিনবাড়ি পৌঁছিতে বিকাল হইয়া গেল। গিরিধারী সাহার দোকানে খবর দেওয়া হইল বটে কিন্তু সেদিন মাল খালাস করিতে কেহ আসিল না। রাত্রে হোটেলে খাইয়া কুবের নৌকায় শুইয়া রহিল, শম্ভু ও বগার সঙ্গে শহরে গিয়া গণেশ যে কোথায় রাত কাটাইয়া আসিল, সকালবেলা বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানা গেল না,

রহস্য করিয়া তিনজনে তাহারা হাসিতে লাগিল। মনে মনে বড়ো রাগিয়া গেল কুবের। এ কী তামাশা জুড়িয়াছে গণেশ তার সঙ্গে? আজীবন যে নির্ভরশীল বোকা লোকটা তাহার তোষামোদ করিয়া আসিয়াছে, সঙ্গদোষে একদিনে সে এমনভাবে বিগড়াইয়া গেল?

একটু বেলায় দোকানের লোক আসিয়া মাল লইয়া গেল। কুবের অবিলম্বে নৌকা ছাড়িল। কেতুপুরের কাছাকাছি আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাওয়া গেল, ঘাটে হোসেন মিয়ার সবচেয়ে বড়ো নৌকাটি বাঁধা রহিয়াছে। দেখিয়া কুবেরের মুখ শুকাইয়া গেল। এত দেরি করার জন্য না জানি হোসেন মিয়া তাহাকে কী বলিবে। শম্ভু এবং বগাও হঠাৎ অত্যন্ত বাধ্য ও কর্মঠ হইয়া গেল, ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড় পড়িতে লাগিল ঝপাঝপ, গতি বাড়িয়া গেল নৌকার।

হোসেন মিয়া নৌকার সামনে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, ছইয়ের মধ্যে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল একটি নগ্নদেহ বছর চল্লিশ বয়সের পুরুষ, দুটি মাঝবয়সি রমণী ও তিনটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় একটি মুসলমান পরিবার। কুবের ওদের চিনিতে পারিল না। হোসেন মিয়ার আত্মীয়স্বজন যে নয় সহজেই টের পাওয়া যায়। ময়লা ছেঁড়া কাপড় ওদের পরনে, শীর্ণ দেহে শুষ্ক মুখে দারিদ্র্যের সুপরিচিত ছাপ।

ভয়ে ভয়ে কুবের হোসেন মিয়ার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু হোসেন মিয়া এতটুকু বিরক্তির লক্ষণ দেখায় না, দাড়িতে হাত বুলাইয়া একবার শুধু জিজ্ঞাসা করে, মাল খালাস দিছ?

কুবের রসিদটা তার হাতে দেয়। তারপর এক টাকা দশ আনা পয়সা ফিরাইয়া দিয়া বলে যে রাহাখরচ বাবদ এক টাকা ছ আনা লাগিয়াছে। বলিয়া তাড়াতাড়ি হিসাবও সে দাখিল করিতে আরম্ভ করে। বেশি নয়, তিনটি টাকা হইতে দু আনা পয়সা মোটে সে চুরি করিয়াছে, তবু বুকের মধ্যে তাহার টিপটিপ করিতে থাকে! হোসেন মৃদু মৃদু হাসে, বলে, রও মিয়া, রও, হিসাব দিবানে পরে।

সেদিন ছুটি।

পরদিন আবার পাড়ি দিতে হইবে।

এবার কাছাকাছি কোথাও নয়, একেবারে সেই চাঁদপুর ছাড়াইয়া মেঘনার মোহনার দিকে! গন্তব্যস্থানটি ঠিক কোথায় হোসেন ভাঙিয়া বলিল না। কুবেরের প্রশ্নে মৃদু মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, ব্যস্ততা কীসের! চাঁদপুর গিয়া কুবের নোঙর ফেলুক, ঠিক সময় সেখানে হাজির হইয়া হোসেন স্বয়ং নৌকার ভার নিবে, বলিয়া দিবে কোন পথে চলিবে নৌকা, কোথায় গিয়া শেষ হইবে যাত্রা।

এবার মাল নয়, মানুষ যাত্রী। হোসেনের নৌকায় যে মুসলমান পরিবারটি আসিয়াছে, তারা।

কুবের ও গণেশ কতদিনে বাড়ি ফিরিতে পারিবে বলা যায় না। বাড়িতে খরচ দিয়া যাওয়ার জন্য হোসেন দুজনকে পাঁচটি করিয়া টাকা দিল।

বাড়ির পথে গণেশের সঙ্গে কুবের কথা বলিল না। বড়ো সে চটিয়াছে গণেশের উপর। গণেশ সঙ্গে সঙ্গে চলে, একথা সেকথা বলে, কুবের নীরব হইয়া থাকে, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াও দেখে না। গণেশের কিনা মোটা বুদ্ধি, কুবের যে রাগিয়াছে এটা সে টের পাইল একেবারে বাড়ির কাছাকাছি গিয়া।

টের পাইবামাত্র সে বিবর্ণ হইয়া বলিল, গোসা করছ নাকি কুবিরদা?

কুবের বলিল, যা যা বাড়িত্ যা, বাজে বকস ক্যান?

বলিয়া সে হনহন করিয়া আগাইয়া গেল। গণেশ ক্ষুধার তাড়নায় তখনকার মতো বাড়ি গেল বটে, ভাতটি খাইয়াই সে আবার হাজির হইল কুবেরের বাড়িতে। কুবের কথা কয় না, চাহিয়াও দেখে না। গণেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া তামাক সাজিয়া নিজে দুটো একটা টান দিয়াই কুবেরের দিকে বাড়াইয়া দিল, বলিল, ধর কুবিরদা।

কুবের হুঁকা গ্রহণ করিল। তবু সে কথা বলিল না!

বিপদে পড়িয়া গণেশ প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, কিবা কর কুবিরদা, আঁই? যামু গিয়া কইলাম, আর আমু না!

তখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কাইল রাইতে ছিলি কই?

প্রশ্ন শুনিয়াই গণেশ হাসিয়া ফেলিল, ফিসফিস করিয়া বলিল, বাক্যা মাইয়া কুবিরদা, কিবা গীত কয়!

বলিয়া সে গুনগুন করিয়া গান ধরিল :

পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই!
আওন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ!
আ লো সই।
থাকলি' ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ন ভাইজা করে খৈ!
আ লো সই!

কুবের বলিল, দূর দূর লক্ষ্মীছাড়া! কুচরিত্তির হইছস, আঁই? ক্যান গেছিলি?

গণেশ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কুচরিত্তির কিবা? গীত শোননে দোষ নাই।

ঠিক বেড়ার আড়ালে মালা বুঝি শুনিতেছিল, ডাকিয়া বলিল, আবার কও গীতখান—শুনছ মাঝি? আবার কও।

কুবের ধমক দিয়া বলিল, চুপ থাক, গীত শুইনা কাম নাই।

খানিক পরে চাঁদপুর যাত্রার কথা উঠিল। আড়াল ছাড়িয়া হাতের ভরে ঘষিয়া ঘষিয়া মালা এবার আসিল কাছে। মুসলমান পরিবারটিকে হোসেন মিয়া কোথায় লইয়া যাইবে অনুমান করিতে কারো বাকি থাকে নাই, কে জানে কোন গ্রাম হইতে ওদের হোসেন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে! কেহ কুপরামর্শ দিবে ভাবিয়া নৌকা হইতে ওদের সে গ্রামে নামিতে পর্যন্ত দেয় নাই। মানুষটি সহজ নয় হোসেন মিয়া! মরুক, তাদের কী? তারা

মাঝি, পয়সা দিয়া যে লগি ঠেলিতে বলিবে তারই হুকুম মানিয়া নৌকা ভাসাইবে পদ্মায়, মানুষ না মাল কী আছে নৌকায় তাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই!

বিকালের দিকে গণেশের খোঁজে উলুপী আসিল, বলিল, যুগল আসিয়াছে। কী খবর যুগলের? সাত দিন পরে তাহার বিবাহ। চার কুড়ি টাকা পণ দিয়া সোনাখালির এক রূপসী কন্যাকে সে ঘরে আনিতেছে।

ভালো কথা। আনুক! কুবেরের কী? আশ্বিনের ঝড়ে সব আশা-ভরসা তাহার উড়িয়া গিয়াছে। চার কুড়ি টাকা! চার কুড়ি টাকার ভাগ্যই যদি তার থাকিবে, পরের নৌকায় মাছ ধরিয়া লগি ঠেলিয়া সে মরিবে কেন আজীবন!

উলুপী আপশোশ করিয়া বলে, যে কপাল গোপির! একটা বছর সবুর সহিল না মেয়ের, ঠ্যাং ভাঙিয়া খোঁড়া হইয়া রহিল। কত পাপ করিয়াছিল আর জন্মে কে জানে!

কুবের বলিল, ক্যান, যুগইলা বিনা মানুষ নাই দ্যাশে?

উলুপী মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া বলিল, কেডা নিব খোঁড়া মাইয়ারে?

কুবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উলুপীর দিকে চাহিল, কিছু বলিল না।

রাত্রে সেদিন হঠাৎ আবার গোপির হাঁটু ব্যথা করিতে লাগিল। মেয়ে কি সহজে নিষ্কৃতি দিবে সকলকে! ওর যে কুক্ষণে জন্ম হইয়াছিল। ভোর ভোর কুবের যখন বাড়ির বাহির হইল, গোপি যাতনায় কাঁদিতেছে। বসিয়া থাকিবার উপায় কুবেরের ছিল না। বেলা হইলে তামাক পাতা নিয়া গোপির হাঁটুতে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে বলিয়া, পথে গণেশকে হাঁক দিয়া, বিরস চিত্তে সে নদীতীরে গেল।

তখনও হোসেন ঘাটে আসে নাই। শম্ভু ও বগা সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া হাই তুলিতেছে। ছইয়ের মধ্যে মুসলমান পরিবারটি তেমনি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। রাত্রে কী ওরা ঘুমায় নাই? আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া আর একজন কে বসিয়া আছে নৌকায়, কাপড়ের পুঁটুলিটা রাখিতে নৌকায় উঠিয়া কুবের তাহাকে চিনিতে পারিল। আমিনুদ্দি।

আমাগো লগে যাইবা নাকি আমিনুদ্দি বাই? কুবের জিজ্ঞাসা করিল।

হ।

মাইয়া কান্দে না?

আমিনুদ্দি সায় দিল, হ। কান্দে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হইবে, নৌকার দড়ি কাছি লগি ও দাঁড়গুলি কুবের পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তক্তা তুলিয়া ভিতরে কতখানি জল উঠিয়াছে মাপিল। কিছু জ্বালানি কাঠ, তামাক ও নারিকেলের ছোবড়া, চাল, ডাল, তেল, নুন, পিতলের দুটা হাঁড়ি, দুটা লোহার কড়াই, কয়েকখানা কাঁসি কাল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এ সমস্তের তদারকও কুবের করিল। কুবেরের দায়িত্ব কি কম! এত বড়ো অভিযানের সে পরিচালক!

তদারক শেষ করিয়া কুবের বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, লক্ষ করিতে লাগিল ছইয়ের

ভিতরের পরিবারটিকে। কী মনমরাই ওদের দেখাইতেছে সকালবেলার ম্লান আলোকে! কারও মুখে কথা নাই, কী যেন ভাবিতেছে সকলে, ভীত ও স্তব্ধ ছেলেমেয়েগুলির পর্যন্ত এতটুকু সাড়া নাই জীবনের! গ্রাম ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

খানিক দেখিয়া কুবের পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিল, নাম কি মিয়া?

সে মৃদুস্বরে বলিল, রসুল।

বাড়ি কই?

মালুর চর।

কথা বলিতে তাহার ভালো লাগিতেছে না বুঝিতে পারিয়া কুবের চুপ করিয়া গেল।

হোসেন মিয়া আসিতে আসিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল। ততক্ষণে জেলেপাড়ার অনেকে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উলুপী আসিয়াছে কলসি কাঁখে, স্বামীকে বিদায় দিয়া সে কলসি ভরিয়া বাড়ি ফিরিবে। লখা ও চণ্ডী আসিয়াই কুবেরের কাছে একটা করিয়া পয়সা দাবি করিয়াছিল, না পাইয়া তাহারা মুখ গোঁজ করিয়া আছে, বিদায় নেওয়ার সময় বাপের কাছে এতখানি নিষ্ঠুরতা তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। রাসুও আসিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিয়াছে। এমনিভাবে একদিন সকালবেলা সে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে রওনা হইয়াছিল। কিন্তু সেকথা রাসুর বুঝি আজ মনে নাই। নির্বিকার চিত্তে সে হোসেন মিয়ার নিকট বিড়ি চাহিয়া ধূমপান করে, যাচিয়া কুবেরকে বারবার শোনায় যে কুবেরের চিন্তার কারণ নাই, তাহার অনুপস্থিতির সময় সকলের দেখাশোনা সে-ই করিবে। কবে ফিরবা মাঝি? ঠিক নাই? তা হোক, রাসু যখন গ্রামে রহিল, বাড়ির জন্য কিসের ভাবনা কুবেরের?

এবার নৌকা খুলিলেই হয়। কুবেরকে পথখরচের জন্য টাকা দিয়া হোসেন নামিয়া গেল। টাকার পরিমাণটা কুবেরকে অবাক করিয়া দিল—কী দরাজ হাত হোসেন মিয়ার! ভয়ও কুবেরের হইল বইকি! এতগুলি টাকা সামলাইয়া রাখা, হিসাব করিয়া খরচ করা, সে বড়ো সহজ কর্মভোগ নয়। সবচেয়ে অস্বস্তির কথা, টাকাটা হাতে আসিবামাত্র তাহার ভাবিতে ইচ্ছা হইতেছে তিন টাকায় যদি দু আনা বাঁচানো যায় নিজের জন্য, চেষ্টা করিলে এতগুলি টাকা হইতে না জানি কত বাঁচানো চলে! কাল হইতে এই কথাই সে থাকিয়া থাকিয়া ভাবিতেছিল বটে, ভাবিতেছিল কত টাকা হোসেন এবার তাহার হাতে দিবে—পথ খরচের টাকাটা অন্য কারো জিম্মায় হোসেন এবার দিবে কিনা এ আশঙ্কাও তাহার ছিল না এমন নয়। আজ টাকাটা পাইয়া সে খানিকক্ষণ অভিভূত হইয়া রহিল। এতখানি বিশ্বাস হোসেন তাহাকে করে? হোসেন মিয়ার মতো মানুষকেও ফাঁকি দিতে পারিয়াছে ভাবিয়া একটু গর্বও কুবেরের হয়। না, লোকটা সর্বশক্তিমান নয়।

কুবের তো জানিত না যে তিন টাকায় দু আনার বেশি ফাঁকি দিবার সাহস তাহার নাই বলিয়াই হোসেন তাহাকে বিশ্বাস করে! পাঁচটা টাকা কুবের কোনোদিন চুরি করিতে

পারিবে না। শুধু সাহসের অভাবে নয়, দু আনার বেলায় যে বিবেক তাহার চুপ করিয়া থাকে পাঁচ টাকার বেলায় তাহাই গর্জন করিয়া উঠিবে।

টাকাগুলি কোমরে বাঁধিয়া কুবের লখা ও চণ্ডীর দিকে চাহিল। তারপর দুটা পয়সা সে ছুঁড়িয়া দিল ছেলেদের দিকে। পয়সা দুটা কুড়াইয়া নিয়া দুজনে চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমন সময়ে দেখা গেল আলুথালু বেশে একটি মেয়ে ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। নৌকার উপর আমিনুদ্দি চঞ্চল হইয়া উঠিল। হোসেন বলিল, নাও খোলো, কুবির।

খোঁটা হইতে নৌকার দড়ি খুলিয়া শম্ভু হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। আমিনুদ্দির মেয়ে যখন ঘাটে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নৌকা তফাতে সরিয়া গিয়াছে। বাপজান, বাপজান বলিয়া আকুল হইয়া মেয়েটা কাঁদিতে লাগিল, নদীতে বুঝি সে ঝাঁপই দিয়া বসে। উলুপী ছাড়া ঘাটে স্ত্রীলোক নাই যে ওকে ধরিবে। উলুপী কলসি কাঁখে জল নিতে আসিয়াছে, আমিনুদ্দির মেয়েকে তাহার ছুঁইবার উপায় নাই। কিন্তু এখন সেকথা ভাবিবার সময় নয়। সে-ই মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল। আমিনুদ্দি হাঁকিয়া হাঁকিয়া মেয়েকে বলিতে লাগিল, সে ফিরিয়া আসিবে, দুদিন পরে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে।

মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল। শম্ভু ও বগা বাদাম তুলিয়া দিল। তারপর কেতুপুরের ঘাট দূর হইতে দূরে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কুবের আমিনুদ্দির কাছে আসিয়া বলিল, মাইয়ারে কইয়া আস নাই?

আমিনুদ্দি মাথা নাড়িল।

দাঁড় বাহিবার প্রয়োজন ছিল না, আস্তে আস্তে বাতাসের জোর বাড়িয়াছে, বাদাম উঠিয়াছে ফুলিয়া। কুবের এবার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নিজের রাজ্যপাট ও প্রজাপুঞ্জের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। রাজ্য প্রকাণ্ড, বসিবার শুইবার স্থানাভাব নাই, শুধু প্রজারা বড়ো অসুখী। মাঝবয়সি রমণীটি, পরিচয় নিয়া কুবের জানিতে পারিল রসুলের সে বোন, যাত্রার আগেই মৃদুস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কত গ্রাম তাহারা পার হইয়া আসিয়াছে, এখনও থাকিয়া থাকিয়া সে চোখ মুছিতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কুবের সকলকে জলখাবার বণ্টন করিয়া দিল। বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় মনটা খারাপ হইয়াছিল, এখন মন্দ লাগিতেছে না কুবেরের। নদীকে সে বড়ো ভালোবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মতো সুখ আর নাই। একে একে কতকগুলি লঞ্চ ও স্টিমার দুদিক হইতে ঢেউ তুলিয়া আসিয়া আগাইয়া যায়, সম্মুখের বোঝাই নৌকাগুলি পড়ে পিছনে। কোথাও নদীর একটি ছাড়া তটরেখা নাই, কোথাও অপর তীরের গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারি, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। স্টিমার, নৌকা,

ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ সব ভাসিয়া চলিয়াছে—তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে পিছনে।

তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা। বৈচিত্র্য? কী তার প্রয়োজন? নূতন পৃথিবী কে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ?

সকালবেলা সুবাতাস ছিল, তারপর বাতাস দিক পরিবর্তন করিল। বিশেষ কিছু অসুবিধা তাহাতে হইল না। দাঁড় টানিতে কোনো কষ্ট নাই। নদীর স্রোতই নৌকা ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছে, ফিরিবার সময় উজান ঠেলিয়া আসিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে বটে, এখন আরামের অন্ত নাই।

মধ্যাহ্নে নৌকা ভিড়াইয়া রান্নার অয়োজন করা হইল। দুটি উনান খুঁড়িয়া দুইটি হাঁড়িতে চাপানো হইল ভাত, কাছের এক গ্রামে তরিতরকারি মিলিল। নিজেদের জন্য রাঁধিবার ভারটা কুবেরের উপরেই পড়িয়াছিল, অদূরে রন্ধনরতা রসুলের বোন নছিবনকে দেখিতে দেখিতে কুবের মনে মনে একটু আপশোশ করিল। ভাবিল, কি ক্ষতি মুসলমানের রান্না খাইলে? ডাঙার গ্রামে যাহারা মাটি ছানিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য থাক, পদ্মানদীর মাঝিরা সকলে একধর্মী। গণেশ, শম্ভু ও বগা সঙ্গে না থাকিলে কুবের তো নিজের জন্য রাঁধিতে বসিত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার নৌকা চলিল। রাত্রি নটা দশটার সময় একেবারে নদীর কিনারায় সুষুপ্ত একখানি গ্রামের পাশে সেদিনকার মতো স্থগিত করা হইল যাত্রা।

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে পাওয়া গেল পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গম। নদী এখানে সাগরের মতোই পারাপারহীন। সন্ধ্যার দেরি নাই দেখিয়া কুবের সেদিন নৌকা বাঁধিল, এদিকে সে আগেও আসিয়াছে বটে, কিন্তু নদী ভালো করিয়া চেনা নয়, সন্ধ্যার পর নৌকা চালাইতে সে সাহস করিল না।

পরদিন চাঁদপুরে নৌকা ভিড়িল।

ভালোয় ভালোয় এতখানি পথ আসিয়া কুবেরের মনে আনন্দ ধরে না। এবার হোসেন মিয়া আসিয়া পড়িলেই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। জাহাজঘাটে স্টিমার ভিড়িলে কুবের গিয়া যাত্রীদের অবরোহণ-পথটির মুখে দাঁড়াইয়া থাকে, মোটঘাট লইয়া দেশ-বিদেশের কত নরনারী তাহার সামনে দিয়া রেল স্টেশনের দিকে চলিয়া যায়, কুবেরের উৎসুক দৃষ্টি অনুসন্ধান করে হোসেনকে। সমস্ত যাত্রী নামিয়া আসিবার পরেও সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে।

হোসেন আসিল তিন দিন পরে রাত্রের স্টিমারে।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে কুবের চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, হোসেনকে দেখিবামাত্র সমস্ত

চাঞ্চল্য তাহার অন্তর্হিত হইয়া গেল। নির্ভয় নিশ্চিন্ত রহস্যময় সদানন্দ মানুষটির সাহচর্যে মুহূর্তে সকল উত্তেজনা জুড়াইয়া যায়—কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গর্ব, আগামী কর্তব্য সম্পাদনের দুর্ভাবনা কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। তাই বটে। ভালোয় ভালোয় কুবের চাঁদপুর আসিয়া পৌঁছিতে না পারিলেও কিছুই আসিয়া যাইত না বটে হোসেনের!—মৃদু মৃদু হাসিয়া সে বলিত, দরিয়ায় চুবাইয়া আইছ নাও? ভালা করছ কুবির বাই!

হোসেন নৌকায় আসিয়া বসিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া রহিল, ছইয়ের মধ্যে নছিবন ও রসুলের স্ত্রী ঘোমটার ভিতর হইতে চাহিতে লাগিল—হোসেনকে দেখিয়াই তাহারা ঘোমটা দিয়াছে।

মৃদু মৃদু হাসে হোসেন, সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে ; দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সকৌতুকে রসুলের ছ বছরের মেয়েটাকে বিবিজান বলিয়া ডাকে। আমিনুদ্দি মেয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিলে বলে তাহাকে সে বাহাল তবিয়তে ঘরের কাজ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, দুশমন বলিয়া গাল দিয়া হোসেনকে সে নাকি কড়া কড়া কথা বলিয়াছে অনেক।

আমিনুদ্দির চোখ ছলছল করে। সে বলে, আল্লা জানে মিয়া, আর ফির্যা আমু না ভাবলি মনডা পোড়ায়।

হোসেন বলে, ফিরনের মন থাকলি কও মিয়া অখন, জাহাজে তুইলা দিই তোমারে কাইল। খুশ না হলি ক্যান যাবা?

আমিনুদ্দি নীরবে মাথা নাড়ে।

হোসেন বলে, তবে কাইল তোমাগো নিকা সারি?

আমিনুদ্দি বিস্মিত হইয়া বলে, কাইল ক্যান? ময়নাদ্বীপি দিবা—দুই মাস বাদ।

হোসেন বলে, ময়নাদ্বীপি মোল্লা পামু কই? রাজবাড়ির আজীজ ছাহাব কন, ময়নাদ্বীপি শও জনা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকতি পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু না নিলি মানুষ পামু কই? হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু না। ক্যামনে দিমু কও? মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুরঘর—না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলব না।

সকলে অভিভূত হইয়া শোনে। হোসেনের মুখে ময়নাদ্বীপের কথা কুবের কখনও শোনে নাই, আজ হোসেন বলিতে থাকে ওই দ্বীপটির জন্য তার কত দরদ। নিলামে দ্বীপটি কিনিবার পর ওখানে জনপদ বসানোর স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আর তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই—হাজার দেড়েক মানুষ ওখানে চলাফেরা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনোখানে অকর্ষিত নাই, মরিবার আগে এইটুকু শুধু সে দেখিয়া যাইতে ায়। কত অর্থ ও সময় সে ব্যয় করিয়াছে দ্বীপের পিছনে! ময়নাদ্বীপের নেশা পাইয়া না বসিলে আজ তো সে বড়োলোক—একসঙ্গে তাহার এতগুলি লাভবান ব্যাবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ভাবিতে বসিলে আল্লার করুণার পরিচয়ে মাথা নত হইয়া আসে।

হ, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে বলিয়া যে কাজে হোসেন হাত দেয় সেই কাজ খোদাতালা সফল করিয়া দেন। টাকা না থাকিলে সে পারিবে কেন এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করিতে?

কী কও রসুল, নিকা সারি কাইল?

রসুল সায় দিয়া বলে, আমি কী কমু মিয়া, যা মন লয় করেন।

হোসেন বলে, বইন কী কয়, জিগাও।

রসুল ছইয়ের মধ্যে গিয়া খানিক পরামর্শ করিয়া আসে। নছিবনের মত আছে। আমিনুদ্দি নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। আপন মনে কী যেন সে ভাবিতে থাকে বন্দরের আলোকমালার দিকে চাহিয়া। কুবের সবিস্ময়ে হোসেনের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ করে। কী প্রতিভা লোকটার, কী মনের জোর! যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে—প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি! হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়তো তাই, আমিনুদ্দির মতো জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতাশ ও নিরুৎসাহ মানুষগুলিকে আসলে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা তাহার দ্বীপটি যে নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে, সে তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া আছে!

অনেক রাত্রে হোসেন বিদায় গ্রহণ করিল। নৌকায় তখন জল্পনা-কল্পনার অন্ত রহিল না। প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া যাওয়ার পর আমিনুদ্দির সঙ্গে সকলে হাস্য-পরিহাস জুড়িয়া দিল। ঠাট্টা করিতে বড়ো মজবুত শম্ভু। তার এক একটা কথায় নৌকায় হাসির কলরব উঠিতে লাগিল, ছইয়ের মধ্যে রমণী দুটি পর্যন্ত মাঝে মাঝে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মুখে কাপড় চাপা দিতে লাগিল।

পরদিন আমিনুদ্দির সঙ্গে নছিবনের নিকা হইয়া গেল। তার পরের দিন কতগুলি চাষের যন্ত্রপাতি, তিন চার বস্তা আলু, এক পিপা সরিষার তৈল, কাঠের একটা বাক্‌সো-বোঝাই নুন, কতকগুলি সস্তা বিলাতি কম্বল, এক বস্তা কাপড়-জামা, এই সব অজস্র জিনিসপত্রে হোসেন নৌকা বোঝাই করিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে বলিল, নাও খোল কুবির বাই।

কোনদিক যামু মিয়া বাই?

হোসেন বলিল, সমুন্দুর!

সারাদিন এই তীর ঘেঁষিয়া নৌকা চলিল। কেতুপুরের পদ্মায় যে নৌকাকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন সেটিকে কুবেরের মোচার খোলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরদিন অপরাহ্ণে নোয়াখালি জেলার নারিকেল বৃক্ষপূর্ণ তীরভূমিতে নৌকা বাঁধা হইল। এদিকে কুবের কখনও আসে নাই, বিস্ময়ের সঙ্গে সে হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কি সমুন্দুর? হোসেন একখানা ম্যাপ বাহির করিল। আঙুল দিয়া সে কুবেরকে চিনাইয়া দিতে লাগিল মেঘনার মোহনার দ্বীপগুলি—সিদ্ধিদ্বীপ, বিদৌদ্বীপ, সন্দ্বীপ, হাতিয়া প্রভৃতি। আরও পশ্চিমে মানপুরদ্বীপ, দক্ষিণ-শারাজপুর, বন্দোরাদ্বীপ। আর ওই যে ছোটো ছোটো বিন্দুগুলি

দেখা যায় বাইশ নম্বর মোটা লাইনটার উপরে, ওগুলি মানিক দ্বীপপুঞ্জ। চিনিতে পারিতেছে কুবের? আর ওই পুব-পশ্চিমের বাইশ নম্বর লাইন আর উত্তর-দক্ষিণের এই একানব্বই নম্বর লাইনটা যে বিন্দুতে পরস্পরকে অতিক্রম করিয়াছে, এই বিন্দুটির কিছু উত্তর-পূর্বে ওই যে একটি সবুজ বিন্দু দেখা যায় ওর নাম ময়নাদ্বীপ। জানে কুবের—ওরই নাম ময়নাদ্বীপ! আর ঘণ্টা দশেক নৌকা বাহিয়া তাহারা নোয়াখালির তীরভূমিকে পিছনে ফেলিবে, তারপর হাতিয়া ডাইনে রাখিয়া ধনমানিকদ্বীপ ছুঁইয়া, ধনমানিকদ্বীপ আর বাবনাবাদদ্বীপের যোগরেখার সঙ্গে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি কোণ করিয়া পূর্ব-দক্ষিণে নৌকা বাহিলে একদিনে ময়নাদ্বীপে পৌঁছানো যাইবে।

কুবের ভালো বুঝিতে পারে না। হাঁ করিয়া নকশার রেখা ও লেখাগুলির দিকে চাহিয়া থাকে। কে জানে ওর মধ্যে মধ্যে ডাঙা ও জলের পার্থক্য কী কৌশলে আঁকা আছে, সে তো কোনো প্রভেদ বুঝিতে পারে না!

হোসেন মিয়া যে কত বড়ো দক্ষ নাবিক, দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের বুকে তাহার নৌকা পরিচালনা দেখিয়াই তাহা বোঝা গেল। সামনে একটা কম্পাস রাখিয়া সে হাল ধরিয়া বসিল, নৌকার ছয়জন মাঝি টানিতে লাগিল দাঁড়। সারাদিন পরে রক্তিম সূর্য সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গেল, পূর্বে বহু দূরে কালো বিন্দুর মতো একটি দ্বীপ ছাড়া সূর্য শুধু দেখাইয়া গেল আকাশ ও জলরাশি। রাত্রেও দাঁড় টানার বিরাম হইল না, পালা করিয়া দুজন দুজন মাঝিকে দুঘণ্টা করিয়া ঘুমানোর অবসর দিয়া চারজনকে হোসেন সবসময়ে বসাইয়া রাখিল দাঁড়ে, নিজে এক মিনিটের জন্যও চোখ বুজিল না। নৌকার সকলে হয়রান হইয়া গেল, কুবেরের মনে হইতে লাগিল নৌকা বাহিয়া জীবনে সে আর কোনোদিন এত শ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই।

সকালবেলা দেখা গেল চারিদিক নিবিড় কুয়াশায় ঢাকিয়া গিয়াছে।

হোসেন বলিল, বইঠা থোও কুবির, নোঙর ফেল।

এতখানি কাছি টানিয়া নোঙর সমুদ্রের তলে গিয়া ঠেকিল যে কুবেরের মনে হইল নোঙরটা পাতালে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কুয়াশায় নৌকা চালাইবার উপায় নাই, ধনমানিক দ্বীপের কাছাকাছি তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে, কুয়াশায় দেখিতে না পাইয়া পাশ কাটাইয়া দূরে চলিয়া গেলে বিপদ হইবে ; এই দ্বীপটির অবস্থান দেখিয়া তবে ঠিক করা যাইবে বাবনাবাদদ্বীপের সঙ্গে ইহার যোগরেখা, তারপর সোজা আগানো চলিবে কম্পাসের উপর নির্ভর করিয়া একেবারে ময়নাদ্বীপের দিকে। সারাদিন নৌকার অবস্থান বুঝিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। অপেক্ষা করিতে হইবে রাত্রির জন্য। রাত্রে তারা উঠিলে ওই যে অদ্ভুত যন্ত্রটা আছে হোসেনের, ওই যন্ত্রের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তবে হোসেন বলিতে পারিবে কোনদিকে কতদূরে ধনমানিকদ্বীপ লুকাইয়া আছে।

কী জানো মিয়া, কলের জাহাজ হলি, জানন যায় কত জোর চলতেছি, ঘণ্টায় কয় মাইল আলাম—সমুন্দুরের কোনখানে রইছি হিসাব করলি মেলে। নাও চালাইয়া জানুম

কিবা?—দাড়িতে হাত বুলায় হোসেন, সকলকে অভয় দিয়া আবার বলে, ডরাইও না, দশ বাজলি কুয়াশা থাকবো না। আইজ কাইল রোজ বিহানবেলা কুয়াশা হয়। এ্যারে কী কুয়াশা কয় মাঝি?

বসিয়া বসিয়া হোসেন গল্প বলে, সকলে শোনে। এ যেন কেতুপুরেরই এক ভাঙা কুটিরে হোসেনের আড্ডা বসিয়াছে। এমনই কুয়াশার মধ্যে একবার সে সমুদ্রের বুকে হারাইয়া গিয়াছিল, তিন দিন নোঙর ফেলিয়া ছিল সমুদ্রে, জল ফুরাইয়া গিয়া শেষের দিন তৃষ্ণায় ছাতি তাহাদের ফাটিয়া গিয়াছিল। তারপর হোসেন কম্পাস কিনিয়াছে, তারা দেখিয়া নৌকার অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র কিনিয়াছে—চাটগাঁয়ে হোসেন যখন জাহাজে কাজ করিত, খালাসির কাজ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত একটা মালবাহী স্টিমারের বো'সান পর্যন্ত সে হইয়াছিল, সেই সময় এক সাহেব কাপ্তেনের কাছে সে এসব যন্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছে। বড়ো বড়ো জাহাজ চালাইয়া হোসেন এখন পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে!

পৃথিবী সে কি ঘুরিয়া আসে নাই? হ, সে কাহিনি বলিবার মতো বটে! কুড়ি বছর বয়সে হোসেন বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়াছিল, তারপর অর্ধেক জীবন সে তো দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াই কাটাইয়াছে—নদীর বুকে ও সমুদ্রে।

অনেক বেলায় আস্তে আস্তে কুয়াশা মিলাইয়া গেল। নোঙর তোলা হইল। দুঘণ্টা পরে দূরে দেখা গেল ধনমানিকদ্বীপ। কম্পাসটা সামনে রাখিয়া হোসেন হাল ধরিয়া বসিল, পরদিন ভোরবেলা তাহারা ময়নাদ্বীপে পৌঁছিয়া নোঙর ফেলিল।

এই ময়নাদ্বীপ? পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া যে রহস্য-নিকেতনের কথা সে শুনিয়া আসিয়াছে? কুবের যেন একটিমাত্র দৃষ্টিপাতে সমস্ত দ্বীপটিকে দেখিয়া ফেলিতে চায়। দ্বীপের খানিকটা ডিম্বাকৃতি, খানিকটা ত্রিকোণ। দ্বীপের দীর্ঘতম পরিসর প্রায় এগারো মাইল—হোসেন নিজে মাপিয়া দেখিয়াছে। দ্বীপের যেখানে নৌকা ভিড়িয়াছিল, সেদিকে খানিকটা অংশ পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপিত হইয়াছে, চাষ হইতেছে, বাকি অংশ জঙ্গলে ঢাকা। পশ্চিম দিকে অসংখ্য নারিকেল গাছ, সমস্ত দ্বীপে ছড়াইয়া না পড়িয়া গাছগুলি একস্থানে ঘন হইয়া মাথা তুলিয়াছে কেন বোঝা যায় না।

জমি অত্যন্ত নিচু, এত নিচু যে আশঙ্কা হয় যেদিন খুশি হইবে সেইদিনই সমস্ত দ্বীপটিকে সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিবে। দ্বীপের মাঝখানে এক মাইল পরিমিত একটা লোনা জলা আছে, সমুদ্রের চেয়েও ওখানটা বুঝি নিচু, খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দিলে সমুদ্রের জল আসিয়া ভরিয়া ফেলিবে। জলার ধারে খানিকটা ধানের জমি করা হইয়াছে, বিস্ময়কর ফসল ফলে। জলায় ও চারিদিকের জঙ্গলে অসংখ্য সাপ আছে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার কিছু নাই, রাসু যে বাঘ সিংহের গল্প করিয়াছিল সেটা নিছক গল্পই।

হোসেন মিয়ার উপনিবেশে লোকসংখ্যা একশোর কম নয়, কিন্তু তার তিনভাগই প্রায় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, যাদের অধিকাংশ এই দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও সাপের সঙ্গে লড়াই করিয়া এখনও হোসেন জয়লাভ করিতে পারে নাই, জঙ্গলের

সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলিয়াছে, অনেক খাদ্য এখানে উৎপন্ন করা যায় না, জীবনের অনেক প্রয়োজন মিটাইতে সমুদ্রপথে পাড়ি দিতে হয় সভ্য জগতের দিকে। অবিশ্রাম খাটুনি এখানে, অসংখ্য অসুবিধা এখানে, জীবন এখানে নির্মম ও নীরব। রাসুর মতো অনেকে তাই পালাইয়া গিয়াছে। হোসেনের পাঁচ বছরের চেষ্টায় দ্বীপে তাই ত্রিশটির বেশি পরিবার নীড় বাঁধে নাই। আমিনুদ্দি ও রসুলকে ধরিলে দ্বীপের গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা এবার বত্রিশ হইল মাত্র।

কী কঠিন কাজে হোসেন মিয়া যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, কী সীমাহীন যে তাহার ধৈর্য ও অধ্যবসায়, এবার কুবের তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে। এই নিচু, জলা ও জঙ্গলপূর্ণ মনুষ্যবাসের অযোগ্য দ্বীপ, ধান ছাড়া আর কোনো ফসল যে দ্বীপের লোনা মাটিতে জন্মে না, লাউ কুমড়াগুলি ফলে কুঁকড়ানো শশার মতো ছোটো ছোটো—এখানে এই মুষ্টিমেয় নরনারীর বসতি স্থাপন করাও হোসেন মিয়া ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভব হইত না। সন্দ্বীপ, হাতিয়া, ধনমানিক, বাবনাবাদ এইসব জনপূর্ণ দ্বীপের কথা কুবের শুনিয়াছে, ময়নাদ্বীপ যদি মানুষের বাসের যোগ্য হইত ওইসব দ্বীপের মতো কবে এখানে গড়িয়া উঠিত গ্রাম। এ কী কদর্য একটা দ্বীপ হোসেন বাছিয়া লইয়াছে?

হয়তো সস্তায় পাইয়াছিল বলিয়া। স্বাস্থ্যকর, উর্বর দ্বীপ কিনিয়া জমিদারি পত্তনের টাকা হোসেন কোথায় পাইত, ওরকম জনহীন দ্বীপই বা কোথায়।

দ্বীপ দেখিয়া আমিনুদ্দি ও রসুল বড়ো দমিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া যাওয়ার কথাটাও তাদের মুখে শোনা গিয়াছে দু-একবার। তবে হোসেনের সামনে তারা কিছু বলে নাই। বলা যায় না। কত উপকার যে হোসেন তাদের করিয়াছে তার হিসাব হয় না। আমিনুদ্দি অপরিশোধ্য আর্থিক ঋণেই শুধু আবদ্ধ নয়, হোসেন না দিলে এ জীবনে স্ত্রী কি আর তাহার জুটিত—নছিবনের মতো স্ত্রী? রসুলকে জেলের দুয়ার হইতে ছিনাইয়া নিয়া আসিয়াছে হোসেন, দেশে ফিরিলে জেলেই হয়তো তাহাকে ঢুকিতে হইবে। প্রতিদানে হোসেন আর কিছুই তাদের কাছে চায় না, তারা শুধু এখানে বাস করুক, স্বপ্ন সফল হোক হোসেনের। ইতিমধ্যে তাদের জন্য ঘর উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে, দয়া করিয়া ওই ঘরে তারা নীড় বাঁধিলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে হোসেন। জঙ্গল কাটিয়া যত জমি তারা চাষের উপযোগী করিতে পারিবে, সব তাদের সম্পত্তি। খাজনা বা চাষের ফসল কিছুই হোসেন দাবি করিবে না। নিজেদের জীবিকা তাহারা যতদিন নিজেরাই অর্জন করিতে পারিবে না, জীবিকা পর্যন্ত যোগাইবে হোসেন। গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব সবই তো পাইলে তুমি, এবার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের, এটুকু পারিবে না?

হোসেনের কাছে ফিরিয়া যাওয়ার কথা তাই কেহ মুখে আনিতে পারে না। ফিরিয়া যে যায়, সে যায় পালাইয়া, চুপিচুপি, চোরের মতো।

হোসেন তাদের ক্ষমা করে। দেখা হইলে রাসুর মতো হোসেন তাদের জঙ্গল সাফ করার মজুরি দেয়। জোর-জবরদস্তি হোসেনের নাই, অন্যায় সে কারও প্রতি করে না।

শুধু তাকেই হোসেন শাস্তি দেয়, ভীষণ ও মর্মান্তিক, যারা শত্রুতা করে হোসেনের, অকারণে ক্ষতি করিতে চায়, বিঘ্ন জন্মায় হোসেনের স্বপ্ন সফল হইবার পথে।

কদিন কুবের দ্বীপ দেখিয়া ও দ্বীপের মানুষগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া কাটাইয়া দিল। খেতের ধান সব কাটা হইয়া গিয়াছে, কিছু সরিষা, বুট ও মটর লাগানো হইয়াছে, মূলা, পালং, কপি প্রভৃতি শাকসবজি গত বছর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে নাই, এবছর কয়েক বিঘা জমিতে নূতন একপ্রকার সার দিয়া পরীক্ষার জন্য কিছু কিছু চাষ হইয়াছে, কী হইবে বলা যায় না।

আরও ভিতরের দিকে দ্বীপের মাটি রবিশস্যের উপযোগী কিনা দেখিবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে এখন অল্প একটু স্থান পরিষ্কার করা হইতেছে। সকালবেলা দা কুড়াল লইয়া একদল লোক জঙ্গলের মধ্যে মাইলখানেক হাঁটিয়া যায়, নির্বাচিত স্থানটিতে গাছপালা ঝোপঝাড় কাটিয়া সাফ করে, শাবল দিয়া খুঁড়িয়া গাছের শিকড় তুলিয়া ফেলে, তারপর সারাদিন মশা ও পোকার কামড়ে শরীর ফুলাইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। কুবের একদিন দেখিতে গিয়া শিহরিয়া ফিরিয়া আসিল। এই দ্বীপটির সৃষ্টির দিন হইতে যে বনভূমি কুমারী, তার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে, চারিপাশে নিবিড় বনের মাঝখানে পরিস্কৃত স্থানটুকু এমনই বীভৎস দেখায়!

কয়েকদিন আগে কী একটা গোলমাল হইয়াছিল দ্বীপে, হোসেন উপস্থিত না থাকিলে অনেকে একত্র হইয়া জটলা করে, ভাসা-ভাসা দুটো একটা কথা কানে আসে কুবেরের। বিপিন নামে ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে হোসেন এখানে মোড়ল করিয়াছে, তাকে ঘিরিয়াই জটলাটা জমাট বাঁধে বেশি, কুবের কাছে গেলেই কিন্তু সকলে চুপ করিয়া যায়। তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম শেষ করিয়া সকলে যখন ঘরে ফিরিয়াছে, নিজের স্বতন্ত্র কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া হোসেন প্রসন্ন মুখে টানিতেছে তামাক, বিপিন কথাটা ফাঁস করিল। বলিল, নালিশ আছে একটা।

নালিশ? হোসেনের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপিন ধীরে ধীরে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। নারী-সংক্রান্ত লজ্জাকর ঘটনা। এনায়েত দ্বীপে আসিয়াছে মাত্র ছমাস আগে, ইতিমধ্যেই সে সকলকে বড়ো জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম প্রথম এর সঙ্গে ওর সঙ্গে প্রায়ই তার কলহ বাঁধিত, একদিন নিরীহ দুর্বল গগন ঘোষকে মারিয়া সে জখম করিয়া দেয়, সকলে মিলিয়া তখন খুব শাসন করিয়া দেয় এনায়েতকে। তারপর হইতে সে বেশ শান্তশিষ্ট হইয়াই থাকে, ব্যাপারটা তাই হোসেনকে জানানো হয় নাই। কিন্তু কদিন আগে সে এক ভয়ানক অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। বসির মিয়ার বউটি ছেলেমানুষ, কিছুদিন হইতে এনায়েত তাকে নাকি বিরক্ত করিতেছিল, ভয়ে বউটি কাহাকেও কিছু বলে নাই। তারপর একদিন দুপুরবেলা সকলে যখন কাজে গিয়াছে, এনায়েত বসিরের ঘরে প্রবেশ করে। বসিরের স্ত্রীর চেঁচামেচি শুনিয়া পাশের কুটিরের আকবরের স্ত্রী গিয়া পড়ায় বেচারি সেদিন ভালোয় ভালোয় রক্ষা পাইয়াছে।

হোসেন বলিল, হারামির পোলারে কাইটা দরিয়ায় দিলা না ক্যান?

বিপিন স্বীকার করিল অতটা তাহারা করিতে পারে নাই, তবে মারধোর করা হইয়াছে যথেষ্ট! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সকলকে হোসেন ডাকিয়া আনিতে বলিল, এনায়েতও যেন আসে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে আসিয়া জুটিল, মেয়েরাও কেহ কেহ আসিয়া তফাতে দাঁড়াইয়া রহিল কৌতূহলের সঙ্গে। বিচার হইবে এনায়েতের। কে জানে তাহাকে শূলেই দিবে না সাগরে ডুবাইয়া মারিবে হোসেন!

এনায়েতের বয়স বেশি নয়, বলিষ্ঠ যুবক সে, ময়নাদ্বীপে এমন আর একটা মানুষও নাই। তেজের সঙ্গে সে আসিয়া হোসেনের সামনে বসিল, নির্ভয় নিশ্চিন্ত। হোসেন একে ওকে দুটো-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল, রুষ্ট চোখে এনায়েতের দিকে চাহিতে লাগিল, বারবার বলিতে লাগিল, কী আপশোশ! কী আপশোশ!

তারপর সে কৈফিয়ত তলব করিল এনায়েতের।

এনায়েত বলিল, জবরদস্তি করি নাই মিয়া।

হোসেন বলিল, না করলা জবরদস্তি, বসিরের ঘরের মদ্যি যাবা ক্যান তুমি? কবিলারে নজর দিবা ক্যান?

আমারে দেইখা একরোজ স্যায় হাসিল!

আরে বলদা তুমি! বাই বইলা হাসিল, দ্যাশগাঁও ছাইড়া দ্বীপের মদ্যি আইসা রইছ, বাই বইন না মাইয়া মরদ এ্যানে? ভালা কাম কর নাই মিয়া। তিন রোজ বাইন্ধা থুমু তোমারে, খানাপিনা মিলব না।

তখন হোসেন মিয়ার হুকুমে সকলে মিলিয়া তাহাকে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। আলগা করিয়াই বাঁধিল, হোসেন মিয়ার হুকুমের চেয়ে দড়ির বাঁধন তো এ দ্বীপে জোরালো নয়, বাঁধন খুলিয়া পালানোর সাহস এনায়েতের হইবে না। কোথায় পালাইবে?

হোসেনের ঘরের কাছেই একখানা ঘরে কুবের ও তাহার সঙ্গীদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেদিন অনেক রাত্রে বাহিরে গিয়া জ্যোৎস্নালোকে কুবের দেখিতে পাইল হোসেনের ঘরের দাওয়ায় বন্দী এনায়েত থালায় ভাত খাইতেছে, কাছে বসিয়া আছে একটি রমণী। চুপিচুপি কুবের ঘুরিয়া হোসেনের ঘরের পিছনের দিকে গেল, জানালা দিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে ডাকিয়া তুলিল।

খবর শুনিয়া হোসেন হাই তুলিয়া বলিল, হ? ঘুমাও গা কুবির। আর শোনো বাই, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাইতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।

বলিয়া হোসেন পাশ ফিরিয়া শুইল।

এত বড়ো একটা ব্যাপারকে অবহেলা করিয়া হোসেনের পাশ ফিরিয়া শোয়া অবাক করিয়া দিল বটে কুবেরকে আজ, ব্যাপার সে বুঝিতে পারিল দ্বীপ ছাড়িয়া ফিরিবার দিন। বুড়া বসির নৌকায় আসিয়া উঠিল, তাহার ছেলেমানুষ বউ রহিয়া গেল দ্বীপে। বসির এ দ্বীপের আদি বাসিন্দা, প্রায় পাঁচ বছর এখানে সে সস্ত্রীক বাস করিতেছে। ছেলেমেয়ে হয়

নাই বসিরের—একটিও নয়। পাঁচ বছরে যে একটিও মানুষ বাড়াইতে পারিল না দ্বীপের, কয়েক বছরের মধ্যে যে প্রবেশ করিবে কবরে, তাকে দিয়া আর কী প্রয়োজন আছে হোসেনের? বসির এবার তালাক দিবে তার বউকে। তারপর যথাসময়ে এনায়েতের সঙ্গে নিকা হইবে বউটির। একটি বউ আছে এনায়েতের, শীঘ্রই সে হোসেনকে উপহার দিবে একটি আনকোরা নতুন মানুষ—ময়নাদ্বীপের এক টুকরা ভবিষ্যৎ। তবুও আরও একটি বউ হোক এনায়েতের, সার্থক হোক দুজনের অন্যায় অসামাজিক প্রেম, পাঁচ বছর যে রমণী জননী হইতে পায় নাই তার কোল জুড়িয়া আসুক সন্তান, মানুষ বাড়ুক হোসেনের সাম্রাজ্যে।

গ্রাম ছাড়িবার তিন সপ্তাহ পরে কুবের ও গণেশ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। চাঁদপুরে তাহাদের নামাইয়া দিয়া হোসেন নৌকা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হোসেনের মুসলমান মাঝিরা চাঁদপুরে অপেক্ষা করিতেছিল।

গোপিকে নিয়া ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কুবের যেদিন চলিয়া গেল সেইদিনই গোপির পা ভয়ানক ফুলিয়া ওঠে। বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই, কী করিবে ভাবিয়া না পাইয়া মালা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। তারপর রাসু আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছে। কত যে করিয়াছে রাসু গোপির জন্য, শত মুখেও মালা তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না। সেইদিনই গোপিকে রাসু আমিনবাড়ির হাসপাতালে নিয়া গিয়াছিল, রাত্রেই গোপির হাঁটুতে আবার অস্ত্র করা হয়। সে এখনও হাসপাতালে আছে, প্রায়ই রাসু তাহাকে দেখিতে যায়। ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছে, হাড় ভাঙিয়া মাংসপেশির জট ছাড়াইয়া গোপির হাঁটু এবার ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একটু খোঁড়াইলেও সে হাঁটিতে পারিবে।

কুবের ফিরিয়াছে খবর পাইয়া রাসু আসে। কুবের দুটো একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেই সে একেবারে গলিয়া যায়। মাথাটা একবার চুলকাইয়া রাসু কয়েকটা ঢোক গেলে। তারপর হঠাৎ বলিয়া বসে, গোপিরে দিবা মাঝি আমারে?

কুবের গম্ভীর হইয়া যায়। বলে যে ব্যস্ততা কিসের? গোপি তো পড়িয়া আছে হাসপাতালে, আগে সে ফিরিয়া আসুক? রাসু তবু পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। গোপির পা ভালো হইয়া যাইবে শুনিয়া অবধি সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, এইসময় কুবেরের কাছে কথা আদায় করিয়া না রাখিলে পরে হয়তো সে মত বদলাইয়া ফেলিবে। গোপির পঙ্গুতা আরোগ্য হওয়া যখন অনিশ্চিত ছিল তখন কথাটা পাকাপাকি করিয়া নেয় নাই বলিয়া বড়ো এখন অনুতাপ হইয়াছে রাসুর।

শেষে কুবের বলে, কাইল কমু রাসু।

রাত্রে সে পরামর্শ করিল মালার সঙ্গে। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, রাসু যদি দেড়কুড়ি টাকা পণ দেয় আর দুকুড়ি টাকার গহনা দেয় গোপিকে তবে এ বিবাহ হইতে পারে। তার কমে হইবে না।

পরদিন রাসু আসিল। কুবেরের দাবি শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল। বলিল, অত টাকা কই পামু?

কুবের তার কী জানে? এই কটা টাকা যদি সে বিবাহে খরচ করিতে না পারে, বিবাহের পর বউকে তবে সে খাওয়াইবে কোথা হইতে?

রাসু মাথা নিচু করিয়া থাকে। মালা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝি মমতা বোধ করে, কুবেরকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া ফিশফিশ করিয়া টাকার পরিমাণটা কিছু কমাইতে বলিয়া দেয়। কিন্তু মেয়েমানুষের পরামর্শে ভুলিবার পাত্র কুবের নয়। গম্ভীর অবিচলিত মুখে সে বসিয়া থাকে বেড়ায় ঠেস দিয়া, চক্ষু মুদিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে রাসু বলে, আইচ্ছা দিমু।

বলিয়া সে উঠিয়া যাইতে চায় কিন্তু এবার কুবের তাহাকে খাতির করিয়া বসায়। আগ্রহ সহকারে গল্প জুড়িয়া দেয় ময়নাদ্বীপের। রাসুর না জাগে উৎসাহ, না আসে মুখরতা। কী হইল রাসুর? এতদিনের স্বপ্ন তাহার সফল হইবে জানিয়া আহ্লাদ হইল না কেন? তামাক সাজিয়া খানিকক্ষণ টানিয়া হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কুবের আড়ালে যায়। কদিন আগেও তাহারা হুঁকা কাড়াকাড়ি করিয়া তামাক টানিয়াছে কিন্তু এখন কিনা রাসু তাহার ভাবী জামাতা, ওর হাতে এখন আর হুঁকা দেওয়া যায় না, ওর তামাক খাওয়ার সময় সামনে থাকা যায় না।

দিন তিনেক পরে কুবের আমিনবাড়ি গিয়া গোপিকে দেখিয়া আসিল। হাসপাতালের খাবার খাইয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই গোপি দিব্যি মোটাসোটা হইয়াছে, পরিষ্কার পরিছন্ন থাকার জন্য রঙের যেন তাহার খোলতাই হইয়াছে বেশ। দিন সাতেক পরে সে ছুটি পাইবে।

রীতিমতো শীত পড়িয়াছে এখন। জেলেপাড়ার ছেলেবুড়ার শরীর রুক্ষ হইয়া খড়ি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মালার চামড়া কিন্তু চিরদিন মসৃণ, হাজার শীতেও কখনও তাহার গা ফাটে না। কপিলারও বুঝি ফাটে না। যে তেলটাই কপিলা খরচ করে শরীরের পিছনে! মাঠে পালং শাকের পাতাগুলিতে যে সরস লাবণ্য ফুটিয়া আছে, কপিলার দেহে হয়তো তার অভাব নাই। মালার বোন তো সে। মালার চেয়ে সে হাজার গুণে শৌখিন।

কাজকর্ম নাই, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কুবের সময় কাটায়। পীতম মাঝির অসুখ হইয়াছে, বুড়া বয়সে তাহার সেবা করিবার কেহ নাই, যুগী তাই আসিয়া বাপের কাছে আছে। পীতম সেবা গ্রহণ করে মেয়ের কিন্তু দিবারাত্রি তাকে গাল দিয়া কিছু রাখে না। যুগীর হাতের জল খাইয়া চিরদিন নরকে পচিবার সাধ যে তাহার নাই, সবসময় এই কথাটা সে ঘোষণা করে এবং ঘোষণা করিতে করিতে গলা কাঠ হইয়া আসিলে যুগীর দেওয়া জল খাইয়াই তৃষ্ণা মেটায়। পীতমের টাকা আছে অনেক। বলে, টাকার লোভে যুগী তাহার সেবা করিতে আসিয়াছে কিন্তু একটি পয়সা সে যুগীকে দিয়া যাইবে না। যা কিছু তাহার

আছে সব সে কালই বাবুদের জিম্মা করিয়া দিবে, তার পলাতক ছেলেটা ফিরিয়া আসিলে সব সে পাইবে। ছেলেটা পীতমের ফিরিয়া আসিল বলিয়া।

রাসু একবার পীতমকে দেখিতে আসিয়াছিল, পীতম তাহাকে দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিয়াছে। রাতারাতি খুন করিয়া ময়নাদ্বীপ ফেরত ডাকাতটা যে তার সর্বস্ব লুটিয়া লইবে অত বোকা পীতম নয়। রাসু কাছে আসিলে সে তার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিবে। শীর্ণ হাত দুটি উঁচু করিতেও পীতমের কষ্ট হয়। রাসুর ঠ্যাং সে কেমন করিয়া খোঁড়া করিবে সেই জানে!

কুবেরের কাছে রাসু মনোবেদনা জানায়। একমাত্র ভাগনে সে পীতমের, তাকে পীতম ত্যাজ্য করিয়া দিল! কত দুঃখ-কষ্ট পাইয়া সে ফিরিয়া আসিল ময়নাদ্বীপ হইতে, দুদিন বাড়িতে ঠাঁই দিল না, অম্লান বদনে খেদাইয়া দিল রাস্তায়। মরিবার সময় এখন কাছে থাকিয়া একটু সেবা করার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে, তাতেও বুড়া তাহাকে সন্দেহ করিবে, বাড়িতে ঢুকিতে দিবে না? তা ছাড়া, নিজের ভাগনে সে পীতমের, বুড়ার টাকাপয়সা বাড়িঘরের একটা অংশ কি তার পাওয়া উচিত নয়? কাকে ওসব দিয়া যাইবে বুড়া?

কুবের বলে, পোলার লাইগা থুইয়া যাইব কয়।

রাসু বলে, পোলা! বাঁইচা আছে নাকি স্যায়? গাঙে ডুইবা গেছে গা কবে!

আলস্যে সময় কাটায় কুবের, গ্রামের জোয়ান মানুষগুলি জীবিকা অর্জনের জন্য বাহির হইয়া যায়, গ্রামে থাকে শুধু বুড়া, শিশু ও নারীর দল, কুবের শুধু শুনিতে পায় পাকা মুখের আপশোশ আর নরম গলার কলহ। দেখা হইলেই হীরু জেলে অনন্তবাবুর নাম করিয়া কুবেরকে পরিহাস করে। কোনোদিন কুবের রাগে, কোনোদিন তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। আজ কতকাল অনন্তবাবু গ্রামে নাই, কলিকাতার বাবু তিনি, জেলেপাড়ায় রাত্রে স্কুল খুলিবার মতলবে কবে তিনি দু-চারবার কুবেরের বাড়ি যাতায়াত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা মনে করিয়া রাখা কী জন্য? শুধু কুবেরের বাড়ি তো নয়! কী পাগলামি মেজোবাবুর আসিয়াছিল কে জানে, জেলেপাড়ার মানুষগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য সময় নাই অসময় নাই আসিয়া হাজির হইতেন, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া দেশের নাম করিয়া কী যেন সব বলিতেন দুর্বোধ্য কথা। কতদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে কত বাড়ির ভিতর হইতে মেজোবাবুকে কুবের বাহির হইতে দেখিয়াছে। তাহার পঙ্গু অসহায় স্ত্রীর নামের সঙ্গে শুধু মেজোবাবুর নামটা হীরু জড়ায় কেন?

হীরুকে একদিন কুবের মারিবে। বেদম মারিবে!

বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সময় কাটায় কুবের, মনটা তাহার ভালো নাই। জগা মাঝির বউ যেন কপিলার অনুকরণ করিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে, ভিজা কাপড়ে পথ চলিতে চলিতে চমকাইয়া উঠিয়া পিছনে কুবেরকে দেখিয়া তাহার চোখে সন্দেহ ঘনাইয়া আসার আগে কুবেরের তো অন্যমনস্কতা ঘোচে না। অপ্রতিভ হইতে হয় কুবেরকে। নকুলের বাড়ির সামনে কুলগাছটার তলে একদিন কপিলার পায়ে কাঁটা বিঁধিয়াছিল। মিছা কথা,

কাঁটা বিঁধে নাই। উঃ, বলিয়া কুবেরকে জড়াইয়া ধরিবার ছল সেটা কপিলার। কেতুপুরে দুর্গা-প্রতিমা দেখিয়া ফিরিবার সময় সেদিন কি ছলনাময়ীই কপিলা হইয়া উঠিয়াছিল!

গোপিকে আনিবার নাম করিয়া কুবের একদিন ভোর ভোর গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামাদাসের বাড়ি আকুরটাকুর গ্রামে, হাঁটা পথে বারো তেরো মাইল। খেতের আল দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে চলিতে কতবার যে কুবের ভাবিল ফিরিয়া আসে, আকুরটাকুরে পৌঁছিয়া একটা পুকুরে মুখ হাত ধুইতে নামিয়া কতবার সে যে পুকুরঘাট হইতেই সোজা আবার আমিনবাড়ির দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করা স্থির করিয়া ফেলিল তার হিসাব নাই!

তবু শেষ পর্যন্ত শ্যামাদাসের বাড়ির দরজাতেই পথ শেষ হইল তাহার।

শ্যামাদাস মাঠে গিয়াছিল। কিন্তু শ্যামাদাসের মা বোন ঘর-বাড়ি জুড়িয়া আছে, কপিলা এখানে ঘোমটা-টানা বউ। কুটুম্বকে শ্যামাদাসের মা খাতির করিয়া বসিতে দিল, কুশল ও এদিকে আসিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। শ্যামাদাসের বাড়িঘর দেখিয়া কুবের মনে মনে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ভালোরকম জবাব দিতে পারিল না। চার ভিটায় চারখানা বড়ো বড়ো ঘর শ্যামাদাসের, চারিদিক লেপা-পোছা ঝকঝকে। ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে কত জিনিস চোখে পড়ে—কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, বাসনকোসন—কত কিছু। উঠানের একপাশে ধানের মরাই অপর পাশে গোয়ালঘর। লক্ষ্মীশ্রী মাখানো সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরসংসার, কুবেরের ভাঙা কুটিরের তুলনায় বৈকুণ্ঠপুরী। বুকের ভিতরে টাটায় কুবেরের। এই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী গিয়া তাহার ভাঙা ঘরে শাকান্ন খাইয়া কটা দিন কাটাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া আজও সে আকাশকুসুম রচনা করে, ভাবে আজও লক্ষ্মীর মন পড়িয়া রহিয়াছে কেতুপুরে তাহার সেই নোংরা নীড়টিতে! কী বোকাই কুবের ছিল!

কপিলা জিজ্ঞাসা করে, খবর কী মাঝি? কী মনে কইরা আইলা? ভালা নি আছে পোলাপানরা?

ডুরে শাড়ি পরিয়াছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল তাহার ভিজিয়া গিয়াছে। দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার, বর্ষার পদ্মার মতো। কী ভীষণ খুশি মনে হইতেছে কপিলাকে! নিজের মলিন কাপড় ও চাদরটির লজ্জায় কুবেরের ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হইতে থাকে।

কয়েক মিনিট সাধারণ কথাবার্তা বলিয়া কপিলা আবার রাঁধিতে যায়। আরও খানিকক্ষণ আলাপ করিয়া কপিলার শাশুড়িও প্রস্থান করে। বাড়ির দু-একটি ছেলেমেয়ে শুধু ঘোরা-ফেরা করে কুবেরের কাছে, তারপর তারাও চলিয়া যায়। কুবের বসিয়া থাকে একা। বোকা, নোংরা, অপদার্থ কুবের। ময়নাদ্বীপের এনায়েত ও বসিরের কথা কুবেরের মনে পড়ে—মনে পড়ে জ্যোৎস্নালোকে হোসেনের কুটিরের দাওয়ায় বন্দি এনায়েতের ভাত খাওয়া; যার জন্য দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে কবার সে মার খাইয়াছে, তারই আনিয়া দেওয়া ভাত! হোসেনের কল্যাণে কদিন পরে মিলনও তাদের হইবে—প্রকাশ্য, সামাজিক,

আইনসঙ্গত মিলন। কী আশ্চর্য ভাগ্য লইয়াই এক-একটা লোক জন্মায় জগতে! বসিয়া থাকিতে থাকিতে পথ চলার শ্রান্তিতে ঢুল আসে কুবেরের। আধ-জাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশকুসুম। সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে, কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিবে—গণেশকেও বলিয়া সে রাজি করিবে যাইতে। হোসেন তাহার চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম কুবির বাই, তাই করুম—আইনা দিমু কপিলারে। তারপর যেন একদিন—

কপিলা আসিয়া বলে, থাকবা নাকি মাঝি?

কুবের বলে, না।

দুইদিন থাইকা যাও? আইছ ক্যান কও দেহি?

সুবচনীর হাটে যামু মন কইরা বাইরইছি কপিলা। তা ভাবলাম তরে দেইখা যাই।

কপিলা মুচকি হাসিয়া বলে, সুবচনীর হাট নাকি আইজ?

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, না?

হাটে গিয়া ঘুমাইয়া থাকগা মাঝি, কাইল হাট কইরা বাড়িত্ যাইও, বলিয়া কপিলা রান্নাঘরে চলিয়া যায়। কুবের উঠিয়া নামিয়া যায় উঠানে। লাউমাচার কাছে গিয়া সে দাঁড়ায়। লজ্জায় মুখখানাতে তাহার মাচার উপরকার উপুড় করা কালো হাঁড়িটার ছায়া পড়ে যেন। কপিলার সঙ্গে সে কেন পারিয়া উঠিবে? পদ্মানদীর বোকা মাঝি সে, এক হাটে কিনিয়া কপিলা তাহাকে আরেক হাটে বেচিয়া দিয়াছে। অনেকদিন আগে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরিয়া কুবেরকে দেখিয়া শ্যামাদাস খুশি হইল। দুজনে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়া একসঙ্গে খাইতে বসিল, অতিথি আসিয়াছে বলিয়া কপিলা আজ অনেক রান্না করিয়াছে। কিন্তু খাদ্যে কুবেরের রুচি ছিল না। কুবেরের হঠাৎ আসিবার কারণটা শ্যামাদাসও জানিতে চাহিল। কুবের এবার এক আশ্চর্য মিথ্যা রচনা করিয়া বসিল। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিতে চাহিবে এমন যদি কেহ জানা থাকে শ্যামাদাসের? অনেক সুবিধা সেখানে বাস করার। বাড়িঘর অন্নবস্ত্র জমিজমা সব এখন বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে, দশ-বিশ বছর পরে দ্বীপে বসতির বিস্তার হইলে তখন নামেমাত্র খাজনা ধার্য হইবে জমির, পুরুষানুক্রমে স্বত্ব জন্মিবে জমিতে। শ্যামাদাস যদি দশজনকে এই সুবর্ণ সুযোগের সংবাদ জানায় আর কেহ ময়নাদ্বীপে যাইতে রাজি হইলে কুবেরকে যদি খবর দেয়, বড়ো ভালো হয় তবে।

শ্যামাদাস অবাক হইয়া বলিল, চা বাগানের ঠিকাদারি নিছ নাকি মাঝি, আঁই?

চা বাগান? কিসের চা বাগান? শ্যামাদাস চলুক না, ময়নাদ্বীপ দেখিয়া আসিবে? আজই চলুক।

তুমি যাও না ক্যান ময়নাদ্বীপি? শ্যামাদাস জিজ্ঞাসা করিল।

কুবের থতোমতো খাইয়া বলিল, যামু। আমিও যামু।

আজ এখানে থাকিয়া যাওয়ার জন্য কুবেরকে অনেক অনুরোধ করিল শ্যামাদাস। কিন্তু থাকিবার উপায় কি আছে কুবেরের! গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহাকে ময়নাদ্বীপের বারতা প্রচার করিতে হইবে।

সুবচনীর হাটের ভিতর দিয়া আমিনবাড়ির পথ। হাটের শূন্য চালাগুলি খাঁ খাঁ করিতেছিল, পথের ধারে স্থায়ী দোকান ও আড়তগুলি শুধু খোলা আছে। একটা খাবারের দোকানের সামনে নড়বড়ে বেঞ্চিটাতে কুবের বসিয়া পড়িল। ভয়ানক শীত করিতেছিল কুবেরের, শরীরটা ছমছম করিতেছিল আর চোখ দুটো করিতেছিল জ্বালা। হুড়মুড় করিয়া জ্বর যে আসিতেছে অনেকক্ষণ আগেই সে তাহা টের পাইয়াছিল। বেঞ্চিটা রোদে সরাইয়া নিয়া চাদর মুড়ি দিয়া সে শুইয়া পড়িল। ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া আসিল, দোকানের ছায়া কুবেরকে অতিক্রম করিয়া হাটের চালাগুলির মাথায় উঠিয়া গেল, কুবের তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল বেঞ্চিটাতে। শেষে ময়রা তাহাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

জ্বর আসিবার মুখে ভোজ খাইয়াছিল, অবস্থা বড়ো শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে কুবেরের। কপিলার স্বামী শ্যামাদাসের অবস্থা ভালো বলিয়া. গরিব সে, জ্বর গায়ে পথে নামিয়া আসিয়াছিল, এত জ্বর যে আসিবে কুবের তা ভাবিতে পারে নাই। মাথার মধ্যে যেন কুয়াশা নামিয়াছে আর শব্দ হইতেছে গমগম। কোথায় কী অবস্থায় সে পড়িয়া আছে তাও মাঝে মাঝে গোলমাল হইয়া যাইতেছে সব—সমুদ্র তরঙ্গ, দুর্গাপূজার আলো, অন্ধকার একটা চাঁচের বেড়ার বাহিরে সারি সারি ঘুমন্ত মানুষ, বারবার জাল নামানো উঠানো, ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা মাছের লাফালাফি সব একাকার হইয়া যাইতেছে। ময়রা মুখের চাদর সরাইয়া দিলে কুবের আরক্ত চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বিড়বিড় করিয়া বলে, শ্যামাদাসেরে খবর দিবা, আকুরটাকুরের শ্যামাদাস?

সন্ধ্যার পর কুবের আবার ফিরিয়া গেল কপিলার কাছে, তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া একটা মোটা কাঁথা তাহার গায়ে চাপাইয়া দিয়া কপিলা রাঁধিতে গেল। অন্ধকার ঘরে কুবের শুইয়া রহিল একা।

শেষরাত্রে ঘাম দিয়া কুবেরের জ্বর ছাড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে ঘুমও ভাঙিয়া গেল তাহার, আর ঘুম আসিল না। একটা বিশ্রী বোঁটকা গন্ধে সে বড়ো অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অল্প অল্প আলো হইলে সে উঠিয়া বসিল। ঘরখানা খুবই ছোটো, ঘরের অর্ধেক জুড়িয়া পাটের স্তূপ আর দরজার কাছে প্রকাণ্ড একটা পাঁঠা বাঁধা, শুইয়া শুইয়া দাড়ি নাড়িয়া জাবর কাটিতেছে।

শরীরটা বড়ো দুর্বল বোধ হইতেছিল কুবেরের। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে গেল। কপিলা উঠানে গোবর লেপিতেছিল, বলিল, কিবা আছ মাঝি?

কুবের ক্ষীণস্বরে বলিল, জ্বর নাই। আমি অখন যামু কপিলা।

এখনই যাইবে কুবের, এই ভোরে? নাইবা গেল সে আজ দুর্বল শরীর লইয়া? একটু

সুস্থ হইয়া কাল গেলে হয় না? অন্তত কিছু খাইয়া যাক সে। এখনই দুধ দুহিয়া কপিলা জ্বাল দিবে, একটু দুধ খাইয়া যাক।

না, কুবের কিছু খাইবে না। প্রয়োজন নাই। পাঁঠা ও পাটের সৌরভে তার পেট ভরিয়া গিয়াছে। বিষণ্ণ মুখে কুবের মাথা নাড়ে। পদ্মানদীর কূল ছাড়িয়া দশ মাইল তফাতে চলিয়া আসিয়াছে সে, মন কেমন করিতেছে তার। পদ্মার বাতাস গায়ে না লাগিলে কেতুপুরের মেছো গন্ধ না শুঁকিলে, সে সুস্থ হইবে না।

কপিলা গোবর লেপা স্থগিত করিয়া বলে, গোসা করছ মাঝি? গোসা কইরো না। ঘরভরা মাইনষের পাল, ঘর নি আছে আর তোমারে দিমু শোওনের লাইগা?

কুবের বলল, হ রে কপিলা, হ। ব্যাজাল পাড়িস না, তর ব্যাজালে গাও জ্বলে।

গাও জ্বলে মাঝি? গাও জ্বলে?

হ, জ্বলে! গোরু ছাগল ভাবস আমারে তুই, খেলা করস আমার লগে। তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইরা গেলাম তরে।

কপিলা ফিশফিশ করিয়া বলে, চুপ কর মাঝি, বেবাকে শুনব। যাইবা যাও, কী আর কমু তোমারে? এউক্কা কথা কইয়া দিই মাঝি, মাথা খাও, দিদিরে কথাডা কইও। কইও, কপিলা পরের ঘরের বউ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রা-ও নাই। অতিথ্ কই থাকবো, অতিথ্ কী খাইবো, কপিলারে কেডা তা জিগায়? দুষি কইরো মাঝি, শাইপো—কিন্তু এই কথাডা কইও দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইও।

কার লগে কথা কস বউ?—ঘরের ভিতর হইতে শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করে।

কপিলা চাপা সুরে বলে, যাও গা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি!

আমিনবাড়ির হাসপাতাল হইতে গোপিকে সঙ্গে করিয়া জলপথে কুবের গ্রামে ফিরিল। তাহার শীর্ণ চেহারা দেখিয়া মালা বারবার জিজ্ঞাসা করিল, কী হইয়াছিল তাহার, ফিরিতে এত দেরি হইল কেন? প্রশ্নগুলিকে এড়াইয়া গেল কুবের। অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ অনেকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুবেরকে যেন নতুন মানুষ করিয়া দিয়াছে. নদী ও নদীতীরের একটানা জীবনে তাহার গত কয়েকটি মাস চিরস্মরণীয়। কোথায় ছিল কপিলা, কোথায় ছিল আশ্বিনের ঝড়, কোথায় ছিল ময়নাদ্বীপ! সব একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়াছে তাহার জীবনে।

গ্রামে ফিরিয়া কুবের দেখিল, রাসু ইতিমধ্যে পীতমের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। যুগীর ছেলে হইয়াছে, পীতমকে কে আর দেখিবে, কাজটা তাই পাইয়াছে রাসু। যুগীর মতো রাসুকেও সে সর্বদা শাপান্ত করে, রাসু নীরবে সেবা করে বুড়ার। রাগও করে না, দুঃখিতও হয় না। রাসুর ধৈর্য দেখিয়া কুবের খুশি হয়, পীতম খুশি থাকিলে রাসু হয়তো কিছু পাইবে টাকা-কড়ি, গোপিরই ভালো হইবে তাহাতে। এমনকী, পীতমকে দেখিতে গিয়া তার কাছে রাসুর কিছু কিছু প্রশংসাও করিয়া আসে কুবের। বলে, মনটা ভালো

রাসুর, দয়ামায়া আছে রাসুর বুকে, নকুল-টকুলের মতো পাজি সে নয়। পীতম শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না, বলে, অরে তুই চিনস না কুবির, অ ডাকাইত। একদিন আমার বুকে চাকু মাইরা সর্বস্ব নিয়া পালাইব হারামজাদা, তুই আছস কোন্ তালে!

কুবের প্রতিবাদ করে। না, রাসু সেরকম নয়। বড়ো ভালো রাসু।

কয়েকদিন পরে হোসেন মিয়া ফিরিয়া আসিলে কুবেরের অলস দিনগুলি শেষ হয়। রকমারি ব্যাবসা হোসেনের, ধান, পাট, বিড়ির পাতা, তামাক, গুড়, চিনি, মশলাপাতি, এক একবার এক একরকম বোঝাই নিয়া কুবের বন্দর হইতে বন্দরে যাতায়াত করে। গোয়ালন্দের অপর তীরে একবার সাতশো ছাগল আসিয়া হাজির, সারাদিন ধরিয়া কুবের তাহাদের নদী পার করিল। ছাগলের গন্ধে বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল কপিলার বাড়িতে এক কষ্টকর রাত্রিযাপনের কথা। পরের বাড়িতে পরের শাসনে নিরুপায় নির্বাক বউ কপিলা যেখানে তাকে পাট-জমানো পাঁঠা-বাঁধা ভাঙা ঘরখানায় শুইতে দিয়াছিল।

তারপর একদিন চাঁদপুর যাওয়ার হুকুম পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে, দিবারাত্রি নৌকা বাহিয়া যাওয়া চাই। গণেশ বিরক্ত হইয়া গজগজ করিতে লাগিল। শম্ভু ও বগা বহুদিন হোসেনের অধীনে কাজ করিয়াছে, তারা কিছুই বলিল না, প্রাণপণে বইঠা বাহিয়া কুবেরকে অবাক করিয়া দিল। হোসেনকে কিছু কিছু কুবের এখন চিনিতে পারিয়াছে। সাধারণত সময়ের হিসাব হোসেনের একটু শিথিল, নৌকার খেপ দিতে মাঝিরা দেরি করিলে কিছু সে বলে না, শম্ভু ও বগা তাই গা ছাড়িয়া দিয়া বইঠা ধরে, কুবেরের তাড়া গ্রাহ্য করে না। কিন্তু হোসেন যখন মুখ ফুটিয়া বলে যে দ্রুতগতির প্রয়োজন, শম্ভু ও বগার সমস্ত শৈথিল্য তখন অন্তর্হিত হয়। এমনভাবে বইঠা বাহিতে থাকে তাহারা যেন ভূতে পাইয়াছে তাহাদের। মনে মনে সায় দেয় কুবের। এমনিভাবেই কাজ নিতে হয় বটে মানুষের কাছে, এমনই কৌশলে। একটু দেরিতে যখন কিছুই আসিয়া যায় না, মাঝিদের সঙ্গে তখন বকাবকি না করিলে, তাড়াতাড়ির সময় দুবার বলিতে হয় না, এতটুকু ইঙ্গিত পাইলে আলস্য-পরিতৃপ্ত মাঝিরা সহসা অতিমাত্রায় কর্মঠ হইয়া ওঠে।

হোসেনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় কুবের প্রতিনিয়তই পায়। বিস্তৃত তাহার কর্মক্ষেত্র, এখানে ওখানে ছড়ানো তাহার জীবন, এলোমেলো তাহার চলাফেরা—তবু চারিদিকে সামঞ্জস্য, সব নিয়মে বাঁধা। একটা জটিল বিশৃঙ্খলায় সে সব শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

চাঁদপুরে হোসেন মিয়া নৌকায় যোগ দিল। ময়নাদ্বীপের পথেই এবারও নৌকা চলিল, নোয়াখালির উপকূলে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের কাছে নৌকা বাঁধা হইল। নৌকায় বোঝাই দেওয়া হইল নারিকেল। বোঝাই শেষ হইল কিন্তু নৌকা খুলিবার হুকুম হোসেন দিল না। দুদিন সেইখানে নিষ্কর্মা হইয়া তাহারা বসিয়া রহিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নদীর মোহনার দিক হইতে মুসুরি বোঝাই প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রগামী বোট আসিয়া ভিড়িল পাশে, চট্টগ্রামবাসী এক বৃদ্ধ মুসলমান নামিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ হোসেনের সঙ্গে করিল পরামর্শ। বোট হইতে তারপর ত্রিপলমোড়া কী যেন

আসিল এই নৌকায়, ছইয়ের মধ্যে পাটাতনের তলে হোসেন তাহা লুকাইয়া ফেলিল। তারপর হোসেন ও বৃদ্ধ মুসলমানটি নামিয়া গেল তীরে, গুনিয়া গুনিয়া হোসেন কতগুলি নোট তাহার হাতে দিল, নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নাও খোলো কুবির বাই।

বড়ো কৌতূহল হইতেছিল কুবেরের। পাটাতনের নীচে কী লুকাইয়া রাখিয়াছে হোসেন? হোসেনকে প্রশ্ন করিবার সাহস কুবেরের হইল না। অনেক রাত্রে নৌকা বাঁধিয়া রাঁধিবার আয়োজন করিবার সময় শম্ভুকে সে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল।

শম্ভু বলিল, আপিম মিয়া, আপিম। চুপ যাও।

আপিম? চুপিচুপি আপিমের ব্যাবসা করে হোসেন? এ তো ভালো কথা নয়! নানাদিকে কত উপার্জন হোসেনের, এইসব অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কেন তার? তা ছাড়া চোরাই আপিমের ব্যবসা করা তো সহজ বিপদের কথা নয়। ধরা পড়িলে কী উপায় হইবে তখন? কুবেরের ভয় করিতে লাগিল। হোসেন মিয়ার সঙ্গে যেদিন সে ভিড়িয়াছে সেইদিন হইতে সে জানে একদিন অনিবার্য বিপদ আসিবে, একেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। আজ কুবের বিপদের স্বরূপটা বুঝিতে পারিল। আজ হোক, কাল হোক, হাতে পড়িবে হাতকড়া, তারপর দু-দশ বছর জেলের বাহিরে কুবেরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ছইয়ের ভিতরটা হোসেন মিয়া দখল করিয়াছে, নৌকার উন্মুক্ত অংশে হোগলার ঢাকনি চাপাইয়া মাঝিরা শয়ন করে। শুইয়া শুইয়া কুবের অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা করিল। একবার ভাবিল, এবার গাঁয়ে ফিরিয়া হোসেন মিয়ার নৌকায় আর সে কাজ করিবে না। জেলে যাওয়ার চেয়ে না খাইয়া মরাও ভালো। কিন্তু না খাইয়া মরার সঙ্গে কুবেরের পরিচয় আছে। হোসেন মিয়ার সঙ্গে ভিড়িয়া জীবনে সে প্রথম সচ্ছলতার সুখ জানিয়াছে, এই কাজ ছাড়িয়া দিলে যে অবস্থা তাহার হইবে খানিকক্ষণ সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া কুবের বুঝিতে পারে, জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই। ক্ষোভে কুবেরের চোখে জল আসে। এ কী অন্যায় হোসেন মিয়ার! এইসব বিপজ্জনক কাজগুলি বাদ দিলেও তাহার তো কাজের অভাব নাই, সেসব কাজে ব্যাপৃত না রাখিয়া কুবেরকে কেন সে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে? তারপর কুবের ভাবে, এইসব ভয়ংকর কাজের সহায়তা যদি তাকে করিতে হয়, বিপদের ভাগ যদি তাহার থাকে, লাভের অংশও তো তার পাওয়া উচিত? জেলে যাওয়ার ঝুঁকি যার সে কি শুধু বইঠা বাহিবার মজুরিই পাইবে?

মনে মনে কুবের কলহ করে হোসেনের সঙ্গে। কল্পনায় সে বারবার এই ঘটনাগুলি ঘটাইয়া যায় : হোসেনের অন্যায়টা বুঝাইয়া দিতে সে ভারি অনুতপ্ত হয়, তাড়াতাড়ি কোমরের কালো বেল্ট হইতে একতাড়া নোট নিয়া সে কুবেরকে দেয়। চার ভিটায় চারখানি বড়ো বড়ো ঘর তোলে কুবের, গোয়াল করে, ধানের মরাই করে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিয়া দেয়। তারপর একদিন কপিলাকে নিমন্ত্রণ করে। কপিলার পা দুটি জড়াইয়া

ধরিয়া বলে যে তাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেরের—ও কপিলা, আমারে ফেইলা আর যাইস না, যাইস না—আমি নি মইরা গেলাম কপিলা তরে না দেইখা?

কেতুপুরে ফিরিয়া কুবের এক আশ্চর্য সংবাদ শুনিল।

পীতমের বাড়িতে চুরি হইয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে ঘরে সিঁদ কাটিয়াছে চোর। ঘরের কোণে কোথায় পীতম মস্ত একটি ঘটি ভরিয়া টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, চোরের তাহা জানিবার কথা নয়। তবু সেইখানটা খুঁড়িয়াই ঘটিটা চোর নিয়া গিয়াছে।

টাকার শোকে বড়ো কাতর হইয়া পড়িয়াছে পীতম। চুরির ব্যাপারে রাসুকেই সে সন্দেহ করে। রাসু নিজে সিঁদ দিয়াছে একথা সে স্পষ্ট বলে না, তবে চোরের সঙ্গে রাসুর যে যোগ আছে তাতে পীতমের সন্দেহ নাই। ঘরের লোক বলিয়া না দিলে ঘটির সন্ধান চোর পাইত কোথায়?

পীতমের গালাগালিতে রাসু কখনও রাগ করে নাই। কিন্তু এবার চুরির অপবাদ দেওয়ামাত্র পীতমকে আচ্ছা করিয়া কড়া কড়া কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এটাও বড়ো সন্দেহজনক।

চুরির অপবাদের জন্য যেন নয়! টাকার সঙ্গেই যেন সে গিয়াছে, এতদিন গেল না কেন তবে, পীতমের যতদিন টাকা ছিল?

কুবের খবর নিতে গেলে পীতম কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোর, রাসু ও বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে তার নালিশ জানাইতে লাগিল। হায়, তার সারা জীবনের সঞ্চয়, সাতকুড়ি তেরোটা টাকা! কোথায় আছে তার পলাতক পুত্র, বুড়ো বাবাকে মনে করিয়া কবে সে ফিরিয়া আসিবে সেই আশায় পীতম যে টাকাগুলি জমাইয়া রাখিয়াছিল! সে কি চোরকে দিবার জন্য? লক্ষ্মীছাড়া রাসুর পেটে যাওয়ার জন্য?

কুবের বলে, রাসু জানল কিবা কই থুইছিলা ঘটি?

তা কি পীতম জানে? যে শয়তান মানুষ রাসু, কেমন করিয়া যেন টের পাইয়া গিয়াছে ঘটিটা কোথায় পোঁতা ছিল, রাসুর অসম্ভব কাজ নাই। ঘটির সন্ধান করিতেই হয়তো সে আসিয়াছিল পীতমকে সেবা করিবার ছলে! সারাদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিত রাসু—একোণ ওকোণ করিয়া বেড়াইত আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঝের দিকে চাহিয়া কী যেন খুঁজিত। তখনই সন্দেহ হইয়াছিল পীতমের। হায়, তখন যদি সে সাবধান হইত!

কুবের বিশ্বাস করিল না রাসুর অপরাধ। ঘটি কোথায় পোঁতা ছিল তাই যদি রাসু জানিবে, চোরের সঙ্গে যোগ দিয়া টাকার সে ভাগিদার জুটাইবে কেন? নিজেই তো অনায়াসে চুপিচুপি ঘটিটা সরাইয়া ফেলিতে পারিত, তারপর গর্ত বুজাইয়া লেপিয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখিলে কতকাল পরে পীতম টাকা চুরির কথা টের পাইত ঠিক ছিল না। সিঁদ কাটিবার হাঙ্গামা রাসু করিতে যাইবে কেন?

চৌকিদার থানায় খবর দিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া চুরির তদন্ত করিল। পুলিশ দেখিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে কাঁপিতে আরম্ভ করিয়া দেয়, হোসেন মিয়ার সঙ্গে এবার নৌকাযাত্রা করিয়া আসিয়া পুলিশের জন্য চিরন্তন স্বাভাবিক ভীতিটা কুবেরের অস্বাভাবিক রকম প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশের কাছে পীতম অম্লান বদনে বলিয়া দিল, রাসুকে সে সন্দেহ করে।

রাসুকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, তার ঘরখানা খুঁজিয়া দেখা হইল, তারপর রাসুর হাতে হাতকড়া না দিয়াই পুলিশ চলিয়া গেল। না, রাসুর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নাই।

পুলিশ চলিয়া গেলে পীতমের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ রাসু যা মুখে আসিল তাই বলিয়া পীতমকে অভিসম্পাত করিল। শুনিয়া কে বলিবে পীতম তার মামা!

তারপর একদিন সকালে কুবেরের কাছে আসিয়া রাসু জিজ্ঞাসা করিল, কবে বিয়া দিবা?

কুবের তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, গতিক কিরে রাসু? পীতম খুড়ার টাকা নি তুই নিছস?

রাসুর মুখখানা একটু বিবর্ণ হইয়া গেল বইকি।

সে বলিল, কী কও লখার বাপ, আঁই? টাকা নাই আমার? কাম করি না আমি?

কী কাম করস?

শেতলবাবু কাম দিছেন, বাবুগো নায়। মামার ঘরে চুরি করুম? অমন কথা কইও না লখার বাপ!

তখন কুবের বলিল, পণের টাকা দিয়া থো না ক্যান তবে?

রাসু বলিল, দিমু। কবে বিয়া দিবা কও?

গোপি সারিয়া উঠিতেছিল। এখনও সে ভালো করিয়া হাঁটিতে পারে না বটে, তবে ক্রমেই পায়ে জোর পাইতেছে। মাসখানেক পরে বিবাহ তাহার দেওয়া যায়। কিন্তু বিবাহের আগে টাকাটা কুবেরের পাওয়া চাই, মেয়ের গায়ে ওঠা চাই গহনা। রাসুর মুখের কথায় নির্ভর করিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়।

যথাসময়ে টাকা ও গহনা দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া রাসু বিদায় লইল। প্রতিজ্ঞা করিল সে অবলীলাক্রমে, রাসুর যেন টাকার ভাবনা শেষ হইয়াছে বাবুদের নৌকায় কাজ পাইয়া, সে যেন বড়োলোকই হইয়া গিয়াছে। টাকা ও গহনার কথা শুনিয়া একদিন মুখে তাহার কালিমা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, আজ সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত!

মালা বলে, রাসুরে য্যান কেমন কেমন দেহি, আমি ডরাই মাঝি।

কুবের বলে, ডরাইয়া কাম নাই তর।

আঁই? বলিয়া মালা অবাক হইয়া থাকে।

কুবের গোপিকে ডাকে। লাঠি ধরিয়া হাঁটিতে বলে গোপিকে। গোপি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়, কষ্টে দু-এক পা হাঁটে। কুবের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া বলে, সারব গোপির মা, খাসা সারব পাওখান গোপির। রাসুর লগে ক্যান দিমু বিয়া?

কইলা যে রাসুরে?

কুবের একগাল হাসে। বলে, তুই নি মাইয়ালোক গোপির মা, বোঝস না। রাসুরে হাতে থুইছি, পাও যদি না সারে মাইয়ার, রাসুর লগেই দিমু। আর সাইরা যদি যায় গোপির মা, পাওখান যদি সাইরা যায় গোপির—

মহোৎসাহে কুবের গোপির হাঁটুতে হাসপাতালের দেওয়া ওষুধ মালিশ করিতে থাকে। জোরে জোরে ঘষে কুবের, ব্যথায় গোপি কাতরায়। কুবের ধমক দিয়া বলে, চুপ থাক, চুপ থাক। জোর জোর না দিমু তো সারব ক্যান? মালিশ করিতে করিতে থামিয়া গিয়া হাঁটুটা সে টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। বলে, ফুলা কমে নাই গোপির মা?

হ। কম য্যান লাগে।

বলিয়া মালা উৎসুক চোখে গোপির পায়ের দিকে চাহিয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে সলজ্জভাবে বলে, মনে এউক্‌কা সাধ ছিল মাঝি। কমু?

হ, এমনইভাবে ভনিতা করে মালা। মালার তামাটে মুখখানা একটু রাঙা দেখায়। আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞাসা করে কুবেরকে, হাসপাতালের যে ডাক্তার গোপির পা ভালো করিয়া দিয়াছে সে কি মালার পা-খানার কিছু করিতে পারে না? একবার গিয়া দেখাইয়া আসিলে হয় কিন্তু। কিছু যদি ডাক্তার না করিতে পারে নাই করিবে, মালার বড়ো সাধ একবার গিয়া দেখাইয়া আসে। কুবের কী বলে?

কুবের গম্ভীর হইয়া বলে, তর পায়ের কিছু হইব না গোপির মা।

কেন? হইবে না কেন? মালা জিজ্ঞাসা করে। আহা, একবার দেখাইয়া আসিতে দোষ কী? ডাক্তার যদি বলে কিছু হইবে না, নিজের কানে শুনিয়া আসিয়া মালা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে। একবার লইয়া চলুক কুবের তাহাকে। একফোঁটা যদি মায়া থাকে তার জন্য কুবেরের বুকে, একবার সে তাকে লইয়া চলুক সদরের হাসপাতালে। কুবের কী বুঝিবে খোঁড়া পায়ের জন্য সারাজীবন কী দুঃখ মালা পুষিয়া রাখিয়াছে মনে!

না? লইয়া যাইবে না কুবের? আই গো কুবেরের পাষাণ প্রাণ! মালার চোখে জল আসে। বিনাইয়া বিনাইয়া সে বলিতে থাকে যে মেয়ের জন্য কুবের দশবার হাসপাতাল যাইতে আসিতে পারে, মালাকে একবার, শুধু একটিবার লইতে তাহার আপত্তি! হ, অনেক পাপ করিয়াছিল আর জন্মে মালা, এবার তাই এমন কপাল লইয়া জন্মিয়াছে। কোলের ছেলেটাকে মালা মাই ছাড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দেয়, ঘুরিয়া বসিয়া দরজার খুঁটিতে ঠকঠক করিয়া মাথা ঠোকে আর কাঁদিতে কাঁদিতে আহ্বান করে মরণকে—যে মরণ এমনই নির্দয় যে মালার মতো পোড়াকপালির দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

চুপ যা গোপির মা, চুপ যা!

কেন চুপ যাইবে? কুবেরের দরদ আছে নাকি মালার জন্য? সে তো কপিলার মতো ভঙ্গি করিয়া হাঁটিতে পারে না যে তাকে লইয়া কুবের আমিনবাড়ির হাসপাতালে যাইবে, হোটেলে রাত কাটাইয়া আসিবে পরমানন্দে!

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, কিবা কথা কস গোপির মা? মাইরা ফেলুম কইলাম! তারপর সে সুর বদলাইয়া বলে, হাসপাতালে যাওনের লাইগা কাঁদনের কাম কী, আঁই? যাইবার চাস নিয়া যামুনে! যা মুখে লয় কইয়া রাগাইস না গোপির মা!

মালা ফোঁসফোঁস করিতে করিতে বলে, নিবা? নিয্যস? নিবা?

নিমু।

কিন্তু মালাকে আমিনবাড়ি নিয়া যাওয়ার সময় কুবেরের হয় না। হোসেন মিয়ার কাজের এখন অন্ত নাই, অবিরত চালান আসিতেছে, চালান যাইতেছে, এ বছর সতেজে ব্যাবসা আরম্ভ করিয়াছে হোসেন। মাঝখানে আবার একবার নৌকা লইয়া নারিকেলের ও চোরাই আপিমের চালান আনিতে কুবেরকে সেই নোয়াখালির উপকূলে যাইতে হইল। এবার আপিম পৌঁছাইয়া দিল একটি স্টিমলঞ্চ, লঞ্চে এক সাহেব আসিয়াছিল, হোসেন মিয়াকে কী তার খাতির! আপিমের পুঁটুলি নিয়া নৌকা চালাইতে এবারও কুবেরের বুকের মধ্যে সমস্ত পথ একটা আতঙ্ক জাগিয়া রহিল। গতবার ফিরিয়া গিয়া হোসেন প্রত্যেক মাঝিকে দশটা করিয়া টাকা বকশিশ দিয়াছিল—এবারও দিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু টাকার কথা ভাবিয়া কুবেরের একবিন্দু আনন্দ হইল না।

গণেশ জিজ্ঞাসা করে, কী ভাব কুবিরদা? ঝিমাও ক্যান? মিয়া বাই আপিম দিছে নাকি?

কুবের বলে, চুপ যা বলদ!

গণেশ বলে, কুকীর মা রুপার পইছা চায় কুবিরদা। ভাবি কী, ইবার মিয়াবাই টাহা দিলি দিমু পইছা গড়াইয়া কুকীর মারে।—গণেশের খুশি ধরে না,কুবেরের গায়ে ঠেলা দিয়া বলে, হোসেন মিয়ার নায় কাম নিয়া বড়ো কাম করছ কুবিরদা। টাহার মুখ দেখিলাম।

কুবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুদূর নদীবক্ষে চাহিয়া বলে, উটা কিরে গণশা? পুলিশের লন্‌চো নাকি?

হ।

কুবের শিহরিয়া বলে, কোন দিকে যায়?

আমাগো দিকে আহে দেহি কুবিরদা।

কুবের বিবর্ণ মুখে হোসেন মিয়ার কাছে যায়। ফিশফিশ করিয়া বলে, পুলিশ লন্‌চো আহে মিয়াছাব।

হোসেন মৃদু মৃদু হাসে, বলে বইঠা ধর গিয়া কুবির বাই। হোসেন মিয়া থাকতি কারে ডরাও? নদীর মধ্যি জাল ফেলাইয়া মাল উঠাইব কোন হালার পুত?

হ? বিপদ ঘনাইয়া আসিলে আপিমের বাণ্ডিল নদীর জলে ফেলিয়া দিলেই চুকিয়া গেল? তাই হইবে বোধহয়! সেইজন্যই হয়তো হোসেন সর্বদা জলপথে আপিমের চালান নিয়া আসে, নতুবা নোয়াখালি হোক চট্টগ্রাম হোক রেলে স্টিমারে চাঁদপুর আসা ঢের সুবিধা। কুবেরের ভয় কিছু কমে। তবু সুদূর পুলিশ লঞ্চের দিক হইতে দৃষ্টি সে

ফিরাইতে পারে না। লঞ্চটি যখন ক্রমে ক্রমে কাছে আসিয়া পাশ দিয়া চলিয়া যায় কুবের শ্বাসরোধ করিয়া থাকে।

একদিন ভোরবেলা বাড়ি ফিরিয়া কুবের মালাকে দেখিতে পাইল না। গোপি বলিল, রাসুর সঙ্গে মালা আমিনবাড়ির হাসপাতালে গিয়াছে।

কুবের রাগিয়া বলিল, কার নায়?

বাবুগো নায়।

তিন দিন নদীর বুকে কাটাইয়া আসিয়াছে। মেজাজ গরম হইয়া ছিল কুবেরের। রাগে সে গুম খাইয়া রহিল। গোপি গড়গড় করিয়া ব্যাপারটা বিস্তারিত বলিয়া গেল। মালা কদিন হইতে রাসুকে তোষামোদ করিতেছিল, কাল মেজোবাবু মোকদ্দমার জন্য আমিনবাড়ি গিয়াছেন, সেই সুযোগে বাবুকে বলিয়া কহিয়া মালা ও রাসু সঙ্গে গিয়াছে।

মেজোবাবু? মেজোবাবুর নৌকায় মালা আমিনবাড়ি গিয়াছে? মেয়ের দিকে কুবের কটমট করিয়া তাকায়। গোপিই যেন অপরাধিনী।

গোপি ভয়ে ভয়ে বলে, লখা লগে গেছে বাবা।

সারাদিন কুবের বাড়ি ছাড়িয়া নড়িল না। জীবনটা হঠাৎ তিতো হইয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে। সমস্ত সকালবেলাটা সে রাগে আগুন হইয়া রহিল, নিধু মাঝি আলাপ করিতে আসিলে তাহাকে অকথ্য গালাগালি করিয়া ভাগাইয়া দিল, বিনা দোষে মারিয়া চণ্ডীকে করিয়া দিল আধমরা। তারপর রাগ কমিয়া অপরাহ্নে আসিল বিষাদ। কেবলই মনে হইতে লাগিল কুবেরের, মালা প্রতিশোধ লইয়াছে। কপিলার সঙ্গে সে কিনা একদিন আমিনবাড়িতেই রাত কাটাইয়া আসিয়াছিল, মালা তাই মেজোবাবুর সঙ্গে সেই আমিনবাড়িতেই গিয়াছে, হাসপাতালে যাওয়ার সেই একই উপলক্ষের ছল করিয়া।

সন্ধ্যা হইল, মালা ফিরিল না। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আসিল হোসেন। কুবের ছাড়া বড়ো ঘরখানা হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া ঘরের মাঝখানের খুঁটি বাহিয়া উঠিয়া নিজে সে চালের খড় ফাঁক করিয়া ছোটো ছোটো দুটি বান্ডিল লুকাইয়া ফেলিল। খুঁটি বাহিতেও জানে হোসেন, গুণের লোকটার অন্ত নাই।

কুবের নীরবে এই অদ্ভুত কাণ্ড চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। নামিয়া আসিয়া হোসেন বলিল, ডরাইও না কুবির বাই, ডর নাই।

কুবের মুহ্যমানের মতো মাথা নাড়িল।

হোসেন বসিল। বলিল যে পুঁটুলি দুটি যতদিন সে না লইয়া যায়, কুবেরের ছুটি। সারাদিন বাড়ি বসিয়া আরাম করিবে কুবের, কেমন? চালে গোঁজা জিনিস দুটিকে সে পাহারা দিবে বটে কিন্তু বারবার ওদিকে চাহিবার প্রয়োজন নাই কুবেরের। একেবারে না তাকানোই ভালো। না, ঘরের চালায় কিছুই গোঁজা নাই কুবেরের। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আজ হোসেন তাহার বাড়ি আসে নাই, খুঁটি বাহিয়া উঠিয়া ঘরের চালে কিছুই সে গুঁজিয়া রাখে নাই।

কী কও কুবির বাই, তাই না? হোসেন মৃদু মৃদু হাসে।

হ, বলিয়া কুবের সায় দেয়।

সকলের চেয়ে বিশ্বাসী, সকলের চেয়ে নিরাপদ এই সরল পদ্মানদীর মাঝিটাকে হোসেন মিয়া যেন ভালোবাসে। কত টাকা হোসেন মিয়ার, দূরে দূরে ছড়ানো কত বড়ো তাহার ব্যাবসা, এগারো মাইল লম্বা একটা দ্বীপের সে মালিক, কুবের তো তাহার চাকর, তবু কুবেরের ঘরে ছেঁড়া চাটাইয়ে হোসেন আরাম করিয়া বসে, বন্ধুর মতো গল্প করে কুবেরের সঙ্গে। চেনাই যেন যায় না এখন হোসেনকে। হোসেনের নৌকায় কাজ নেওয়ার আগে কুবের তো তাকে শুধু সংগতিপন্ন বলিয়া জানিত, অসংখ্য উৎস হইতে হোসেনের যে কত টাকা আসে এখন ভাবিতে গেলে কুবেরের মাথা ঘোরে! সে আর গণেশ শুধু জানিয়াছে, কেতুপুরের আর কেহ হোসেন মিয়ার রহস্য জানে না।

টাকাওয়ালা মানুষের সঙ্গে মেশে না হোসেন, তাদের সঙ্গে সে শুধু ব্যাবসা করে, মাল দিয়া নেয় টাকা, টাকা দিয়া নেয় মাল। মাঝিরা তাহার বন্ধু। অবসর সময়টা সে পদ্মার দীন দরিদ্র মাঝিদের সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দেয়, টাকায় ফাঁপানো ব্যাগ পকেটে নিয়া বর্ষার রাত্রে জীর্ণ চালার তলে চাটাইয়ে শুইয়া নির্বিবাদে ঘুমাইয়া পড়ে।

সেদিন রাত্রে মালা ফিরিল না।

পরদিন বেলা বারোটার সময় হাতের ভরে দুলিয়া দুলিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিল, নদীর ঘাট হইতে এতটা পথ এমনিভাবে আসিতে কাপড়খানা তাহার কাদামাখা হইয়া গিয়াছে। কুবের খাইতে বসিয়াছিল, একবার চাহিয়া দেখিয়া আবার খাওয়ায় মন দিল। ঘরে গিয়া কাপড় বদলাইয়া মালা দাওয়ায় আসিয়া বসিল। কুবের চোখ তুলিয়া তাকায় না। চড়া গলায় পিসিকে আর দুটি ভাত আনিতে বলে।

মালা বলে, আগো শুনছ?

না, কুবের শুনিতে পায় না, সে বধির হইয়া গিয়াছে!

মালা বলে, তুমি তো নিলা না, রাসুর লগে তাই হাসপাতাল গেছিলাম। গোসা নি করছ?

জবাবের জন্য মালা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর সজল কণ্ঠে বলে, ডাক্তর কয়, পাও সারনের না আমার।

আরও কত কথা মালা বলে, কুবের সাড়াশব্দ দেয় না। খাইয়া উঠিয়া নীরবে তামাক টানিতে থাকে। গোঁয়ার কি সহজ কুবের!

মালা শেষে রাগিয়া বলে, ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কবে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউক্কা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান?

যা, বেড়া গিয়া মাইজা কত্তার লগে—হারামজাদি, বদ!

কী কইলা মাঝি, কী কইলা?

তারপর কী কলহই দুজনে বাঁধিয়া গেল। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিল, দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। শেষে রাগের মাথায় কুবের হঠাৎ কলিকাটা মালার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। কলিকার আগুনে মালা ও তাহার কোলের শিশুটির গা স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল, কাপড়েও আগুন ধরিয়া গেল মালার। সিধুর বোন ছুটিয়া আসিয়া কাপড়খানা টানিয়া খুলিয়া লইল, নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া লজ্জা নিবারণ করিল মালার। দুঃখিনী সে, বড়ো ছেঁড়া তাহার কাপড়খানা।

স্ত্রী-পুরুষে ভীড় করিয়াছে অঙ্গনে, তাদের সামনে পঙ্গু অসহায়া স্ত্রীর এই দশা, মালার দুরবস্থায় আমোদ পাইয়া সকলে হাসিয়াছে, কে যেন হাততালি দিল। এতক্ষণে চমক ভাঙিল কুবেরের। লাফাইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া গাল দিতে দিতে সকলকে সে বাড়ির বাহির করিয়া দিয়া আসিল। তারপর নিজের একখানা কাপড় আনিয়া দিল মালাকে।

ক্রমে ক্রমে শীত কমিয়া আসিল।

কেতুপুর গ্রাম ও জেলেপাড়ার মাঝামাঝি খালটা শুকাইয়া গিয়াছে। পদ্মার জলও কমিয়াছে অনেক। ক্রমে ক্রমে মাঠগুলি ফসলশূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, পায়ে চলা পথগুলি স্পষ্ট ও মসৃণ হইয়া আসিয়াছে অনেকদিন আগে। আমগাছে কচিপাতা দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাখির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে দেশে। ঝাঁক বাঁধিয়া বুনো হাঁসের দলকে উড়িতে দেখা যায়। উত্তরাভিমুখী নৌকাগুলি দক্ষিণের জোরালো সমগতি বাতাসে বাদাম তুলিয়া তরতর করিয়া ভাসিয়া যায়, দূরে গেলে অতিথি হাঁসগুলির মতোই রহস্যময় মনে হয় তাদের। মাছ দুধ সস্তা হইয়াছে, পদ্মার চর হইতে কলসি-ভরা দুধ আসিয়া বাজারে চার পয়সা সের বিকাইয়া যায়।

শীতে কুঁকড়ানো গ্রামগুলি গা মেলিয়াছে। সকাল সন্ধ্যায় মালা কাপড় ভাঁজ করিয়া লখা ও চণ্ডীর শরীর ঢাকিয়া গলায় বাঁধিয়া দেয় না, খালি গায়েই তারা শুকনো ডোবা পুকুরে কাদা ঘাঁটিয়া মাছ ধরিতে যায়। ফাটা চামড়া উঠিয়া গিয়া ত্বক মসৃণ হইয়া আসিতেছে সকলের, মালার রং যেন আরও ফরসা হইয়া আসিয়াছে, একমুষ্ঠি যৌবন যেন অতিরিক্ত আসিয়াছে মালার দেহে। মালাকে চাহিয়া রাত্রে কুবেরের ঘুম ভাঙে : কোনোদিন গৃহে, কোনোদিন পদ্মার বুকে।

রাসুর সঙ্গে গোপির বিবাহের বন্দোবস্ত কিন্তু হইয়া গিয়াছে বাতিল। এ কীর্তিও হোসেন মিয়ার। সোনাখালির একটি পাত্র হোসেন ঠিক করিয়া দিয়াছে গোপির জন্য। তার নাম বঙ্কু, বয়স বেশি নয়। এ জগতে বঙ্কুর আপনার কেহ নাই বটে কিন্তু হোসেন মিয়া আছে। হোসেন মিয়া যার মুরুব্বি, কিসের অভাব তার? বঙ্কু পাঁচকুড়ি টাকা পণ দিবে কুবেরকে, গোপিকে গহনা দিবে তিনকুড়ি টাকার, আর একদিন জেলেপাড়ার সকলকে দিবে ভোজ।

একথা জানিতে কুবেরের বাকি নাই যে বিবাহের পর নবদম্পতিকে হোসেন ময়না-দ্বীপে লইয়া যাইবে, কিন্তু জানিয়া কী লাভ? হোসেন মিয়ার অবাধ্য কুবের কেমন করিয়া

হইবে? তা ছাড়া পাঁচকুড়ি টাকার মায়া ত্যাগ করিবার সাধ্য কুবেরের নাই। বিবাহ দিলে মেয়ে পরের ঘরে যায়, কাছে অথবা দূরে। গোপি না হয় যাইবে দূরে—অনেক দূরের ময়নাদ্বীপে। হয়তো কখনও একটু মন কেমন করিবে কুবেরের। কিন্তু তার প্রতিকার কী? মন তো অনেক কারণেই কেমন করে মানুষের!

খবর শুনিয়া রাসু গালাগালি করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে, কথা দিয়া কথা রাখিল না কুবের, কুবেরের সে সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। যুগীকে গিয়া রাসু বুঝি ধরিয়াছে, তারপর একদিন শীতল আসিয়া রাসুর স্বপক্ষে খানিকক্ষণ ওকালতি করিয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে। বলিয়াছে, টাকা যদি বেশি চায় কুবের, সে তা বলে না কেন? সোনাখালির পাত্র যত টাকা দিতে চায় তাই দিবে রাসু। গ্রামে রাসুর মতো পাত্র থাকিতে দূর দেশে মেয়েকে কুবের পাঠাইবে কেন?

কেন? এ কেন-র জবাব দিবার ক্ষমতা নাই কুবেরের! ময়নাদ্বীপে গিয়া গোপিকে বাস করিতে হইবে ভাবিলে জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মতো মাঝে মাঝে তারও মনটা কি ছটফট করে না? তবু তাকে এসব বলা মিছে।

একদিন গোয়ালন্দে অধরের সঙ্গে কুবেরের দেখা হইয়া গেল। অধর বলিল, কয়েকদিন আগে কপিলা চরডাঙায় আসিয়াছে, কিছুদিন থাকিবে। বাড়ি ফিরিয়া কুবের সেদিন মালাকে বড়ো দরদ দেখায়। বলে, মালা কতকাল বাপের বাড়ি যায় নাই, ইচ্ছা করে না যাইতে? ইচ্ছা যদি হয় তবে না হয় চলুক মালা কাল, দু-চার দিন থাকিয়া আসিবে। মালা বলে, না, বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা তাহার নাই। বাপ কি যাইতে বলিয়াছে তাকে? এতকাল সে যে যায় নাই, একবার কি দেখিতে আসিয়াছে তাকে? মালা কাঁদো কাঁদো হইয়া যায়। বলে, তার মনটা শুধু পোড়ায় বাপ ভাইয়ের কথা ভাবিয়া, তার জন্য ওদের কারও দরদ নাই। কেন সে যাইবে বাপের বাড়ি যাচিয়া? কুবের বিপন্ন হইয়া বলে, গেলে দোষই বা কী? বাপের বাড়ি তো বটে, যাচিয়া বাপের বাড়ি যাইতে কারও লজ্জা নাই। কালই চলুক মালা, দুদিন একদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে?

এবার মালা সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, যাওনের লাইগা জিদ কর ক্যান মাঝি?

জিদ কিবা? দরদ কইরা কইলাম, জিদ!

মালার উপর রাগের সীমা থাকে না কুবেরের। চরডাঙা যাওয়ার আর তো কোনো ছুতা তাহার নাই! জামাই অকারণে শ্বশুরবাড়ি গেলে দোষ অবশ্য কিছুই হয় না কিন্তু এখন কপিলা ওখানে আছে, হঠাৎ কুবেরের আবির্ভাব ঘটিলে কে জানে কে কী ভাবিয়া বসিবে। বসিয়া বসিয়া কুবের উপায় চিন্তা করে আর ক্রুদ্ধ চোখে মালার দিকে থাকিয়া থাকিয়া তাকায়। হ, আজ বসন্তের আদর্শ আবহাওয়া আসিয়াছে কেতুপুরে, দোলের উৎসব হইবে কাল, লখা ও চণ্ডী আবির কিনিয়া আনিয়া আজই অঙ্গনে খানিক ছড়াইয়াছে।

বিকালে পদ্মার ঘাটে নৌকার তদবির করিতে গিয়া কুবেরের আরও মন কেমন করিতে থাকে। কাব্যের মসৃণ মার্জিত মন-কেমন করা নয়, তার ভীরু প্রকৃতির সঙ্গে যতখানি

খাপ খায় ততখানি দুরন্ত মানসিক অস্থিরতা। পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া শরীরটা কুবেরের ভালো হইয়াছে—খাদ্য যতটুকু শক্তি দিত আগে ব্যয় করিতে হইত তাহার দশগুণ, এখন সেটা শুধু বন্ধ হয় নাই, বিশ্রামও জুটিয়াছে অনেক। মনেরও যেন তাতে ব্যাকুল হওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়াছে এবং কমিয়া গিয়াছে দুর্বল অভিমান, সিদ্ধি বা আপিমের নেশার মতো আগে যা কুবেরের মনকে অনেকটা শান্ত করিয়া রাখিত। নৌকায় বসিয়া কুবের যেন ভুলিয়া যায় যত নিষ্ঠুরতা করিয়াছে কপিলা, যত দুর্বোধ্য নির্মম খেলা সে খেলিয়াছে তার সঙ্গে! মনে পড়ে শুধু কপিলাকে, কপিলার লীলা-চাপল্য, কপিলার হাসি ও ইঙ্গিত, তেলে-ভেজা চুল ও কপাল আর বেগুনি রঙের শাড়িখানি। আর মনে পড়ে শ্যামাদাসের উঠানে ভোরবেলা গোবর লেপায় রত কপিলাকে, মালাকে বলিবার অনুরোধ মেশানো তার শেষ সকাতর কথাগুলি। ক্যান আইছিলা মাঝি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল না কপিলা? হ, ও জিজ্ঞাসার মানে কুবের বোঝে। আবার তাই যাইতে চায় কুবের কপিলার কাছে, এখনই যাইতে চায় শস্যহীন শুকনো মাঠগুলি উর্ধ্বশ্বাসে পার হইয়া চরডাঙায়, কপিলা যেখানে চুল বাঁধিতেছে।—কুবেরকে দেখিয়া তার বোতলটি কাত করিয়া আরও খানিকটা তেল মাথায় ঢালিবে কপিলা : তার উত্তোলিত দুটি বাহু, মুখের ছলনাভরা হাসি, বসিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি সব পাগল করিয়া দিবে কুবেরকে। ঘাটে আরও নৌকা আছে, মাঝি আছে। এখানে থাকিতে ভালো লাগে না কুবেরের, বাড়ি ফিরিতেও ইচ্ছা হয় না। নদীর ধারে ধারে সে হাঁটিতে আরম্ভ করে, ভাঙিয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত তীরের ফাটলধরা অংশগুলির উপর দিয়া। চলিতে চলিতে একসময় দশ-বারো হাত ডাঙা তাকে সঙ্গে করিয়া ধ্বসিয়া পড়ে নীচে, শীতের পদ্মার জল যেখান হইতে হাত পনেরো পিছাইয়া গিয়াছে। মাটির একটা চাপড়াই বুঝি মাথায় ঘা দিয়া কুবেরকে অজ্ঞান করিয়া দেয়। মিনিট দশেক পরে চেতনা হয় কুবেরের। প্রথমে কুবেরের মনে হয় এ বুঝি কপিলারই এক কৌতুক। তারপর কষ্টে উঠিয়া বসিয়া সে নিঝুম হইয়া থাকে। শেষ বেলার সূর্য যেন পদ্মাকেও নিঝুম করিয়া দিয়াছে, দূরের নৌকাগুলি এবং আরও দূরের স্টিমারটি যেন হইয়া গিয়াছে গতিহারা। বাতাসের জোর নাই, নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন ক্লান্ত। নিজের এলোমেলো চিন্তাগুলিকে কুবের ভালো বুঝিতে পারে না। মাথার মধ্যে একটা ভোঁতা বেদনা টিপটিপ করিতেছে। মাথার বাঁ পাশটা দিয়া একটু রক্তও পড়িয়াছে। তাই বলিয়া কেবলই এখন মনে আসিতে থাকিবে কেন গণেশের সেই গান—পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই? কার সঙ্গে পিরিত করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে কুবের? কপিলার সঙ্গে? হ, ভারী মেয়েমানুষ কপিলা! তার সঙ্গে আবার পিরিত। ছেলেমানুষ নাকি কুবের?

পদ্মায় স্নান করিয়া কুবের বাড়ি ফিরিল। ভাত খাইতে বসিয়া হঠাৎ কুবের বলিল, চরডাঙা যাবি লখা?

যামু বাবা, যামু।

কাইল বিয়ানে মেলা দিমু, আঁই?

হ, এ ফন্দি মন্দ নয়। দোলের উৎসবে মামাবাড়ি যাইবে ছেলেরা। একা তো যাইতে পারিবে না তারা, কুবের তাই সঙ্গে যাইবে। কেহ টেরও পাইবে না কিসে কুবেরকে টানিয়া আনিয়াছে চরডাঙাতে!

মালা বলিল, আগো, নিয়া যাইবা ত আমারেও নিয়া চল।

কুবের বলিল, না, তরে নিমু না। যাবি না কইলি ক্যান?

কুবের বাঁচিয়াছে। মালাকে লইয়া চরডাঙা যাওয়া কি সহজ কথা! রাজি না হইয়া ভালোই করিয়াছে মালা, যাতায়াতের ডুলিভাড়াটা কুবেরের বাঁচিয়া গেল।

মালা এখন যাইতে চায়। ছেলেদের লইয়া কুবের যদি সত্যসত্যই যায় চরডাঙা তবে আর সে যাইবে না কেন? কুবের তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা তুলিয়াছিল বলিয়াই না প্রথমটা সে রাজি হয় নাই? মালা স্বামীর তোষামোদ আরম্ভ করে। রাত্রে খানিক রাগারাগি কাঁদাকাটা করিতেও ছাড়ে না। কিন্তু কুবের অটল। যাইবে না বলিল কেন মালা? কুবের যখন তোষামোদ আরম্ভ করিয়াছিল বাহাদুরি করিয়া তখন যাইতে অস্বীকার করিল কেন? মরিয়া গেলেও কুবের তো তাকে চরডাঙায় লইবে না! হ, কুবেরের গোঁ মালা জানে না। কী ভাবিয়াছে সে কুবেরকে?

রাত্রি থাকিতে উঠিয়া লখা ও চণ্ডীকে টানিয়া তুলিয়া কুবের রওনা হইয়া গেল। মাথা কপাল কুটিয়া যাওয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল মালা, কুবের ফিরিয়াও তাকাইল না। সকাল-সকাল তাহারা পৌঁছিল চরডাঙায়। হাঁটিতে হাঁটিতে ছেলে দুটার পা ব্যথা হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীকে মাঝে মাঝে কোলে করিয়া চলিতে হওয়ায় কুবেরের ধরিয়া গিয়াছে হাঁপ। শ্বশুড়বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া গামছা দিয়া সে ঘাম মুছিতে লাগিল। একটু পরে কপিলা একখানা পাখা আনিয়া দিল। কুবের খুশি হইয়া বলিল, আছস কিবা কপিলা?

কিবা দ্যাখ?

কাহিল য্যান লাগে তরে।

হ, কাহিল হইছি।

কুবের ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ক্যান রে কপিলা, অসুখ নি করছে তর?

মনডার অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি।

বলিতে বলিতে আঁচলের আড়াল হইতে হাত বাহির করিয়া এক ভাঁড় চুন-হলুদ কপিলা কুবেরের গায়ে ঢালিয়া দেয়। হাসিয়া গলিয়া পড়ে কপিলা। কুবের মূঢ়ের মতো চাহিয়া থাকে। আনন্দ অথবা দুঃখ কিসে তাহার রোমাঞ্চ হয় সে বুঝিতে পারে না। কেতুপুরে থাকিবার সময় এমনিভাবে হাসিত কপিলা। আকুরটাকুরে শ্যামাদাসের বাড়িতে এ হাসির আভাসও কপিলার মুখে সে দেখিতে পায় নাই।

কপিলার হাসির শব্দে বৈকুণ্ঠ বাহিরে আসে। লখা ও চণ্ডীকে সঙ্গে করিয়া কপিলা চলিয়া যায় ভিতরে।

শ্যামাদাসের কাছে বৈকুণ্ঠ ময়নাদ্বীপের কথা শুনিয়াছে। সে সেই কথা আরম্ভ করিল। কথায় কুবেরের মন ছিল না, সে অন্যমনে বৈকুণ্ঠের কথার জবাব দিয়া গেল।

রং ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলের উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এ পাড়ায় বেশি। চাষাভূষা জেলে-মাঝির পাড়া এটা, এখানে রঙের বড়ো অনটন। অনেক বেলায় কাদামাখা মূর্তিসমূহের একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। গাধার মতো ক্ষুদ্রকায় একটা ঘোড়ার উপরে বিচিত্র সাজে দোলের রাজা অতি কষ্টে বসিয়া আছে, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোর মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্ন-ভিন্ন জামা, চারিদিকে লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া। সামনে দিয়া যাওয়ার সময় শোভাযাত্রার লোকেরা কুবের, বৈকুণ্ঠ ও অধরকে কাদা মাখাইয়া দিয়া গেল, অধর ভিড়িয়া গেল দলে। তাথৈ তাথৈ নাচ, ছুটাছুটি, হইচই, ডোবা পুকুরের পাঁক তুলিয়া যাকে খুশি ছুঁড়িয়া মারা—আনন্দ বটে দোলের! খানিক ইতস্তত করিয়া লখা ও চণ্ডী অধরের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য ছুটিয়া গেল, কুবেরের বারণ কানেও তুলিল না।

কাদা ধুইয়া স্নান করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে কুবের গেল পুকুরে। কপিলা বুঝি টের পাইয়াছিল। খানিক পরে সেও পুকুরঘাটে আসিয়া হাজির।

আমারে রং দিলা না মাঝি?

পাঁক দিমু কপিলা? রং ত নাই!

দূর অ! রং নাই, পাঁক দিবার চায়! দিও না মাঝি পাঁক, দিও না কইলাম!

পাঁক দিতে বারণ করে কপিলা কিন্তু পা পিছলাইয়া কাদা মাখিয়া জলে সে গড়াইয়া পড়ে। হাতের ঠেলায় কলসি ভাসিয়া যায় কুবেরের দিকে। কপিলা বলে, ধর মাঝি, কলস ধর।

বলে, আমারে ধর ক্যান? কলস ধর।

হ, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসির মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে বুকে কাপড় টানিয়া হাসিবার ভান করিয়া কপিলা বলে, কথা যে কও না মাঝি?

কুবের বলে, তর লাইগা দিবারাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা।

কপিলা চোখ বুজিয়া বলে, ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামির ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি—পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে। ছাড়, মানুষ আহে।

সাঁতার দিয়া কপিলা কলসি ধরিয়া আনে। কাপড় ঠিক করিয়া ভরা কলসি কাঁখে তুলিয়া পিছল ঢালু পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। হ, ফিরিয়া একবার তাকায় কপিলা। ভরা কলসির জল খানিকটা উছলাইয়া পড়ে।

দুপুরে খাইয়া উঠিয়া কুবের বলে, লখা, চণ্ডী, ল মেলা করি। দিনে দিনে গাঁয় ফিরুম।

মালা বিস্মিত হইয়া বলিল, আইজ ফিরা আইলা যে?

মাইনযে থাকে তর বাপের বাড়ি?

পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া লখা ও চণ্ডী আধমরা হইয়া গিয়াছিল। কুবেরও কম শ্রান্ত হয় নাই। জিরাইয়া জিরাইয়া গ্রামে পৌঁছিতে তাহাদের সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছিল। লখা ও চণ্ডী দুটি দুটি ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িল। কপিলা চরডাঙায় আসিয়াছে তাদের মুখে এ খবর শুনিয়া মালা গম্ভীর হইয়া গেল। কুবেরকে আর সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। খোঁড়া পা-টি টান করিবার চেষ্টাতেই বোধ হয় একবার তাহার মুখখানা হইয়া গেল বিকৃত। কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে নিজের পঙ্গুতা সম্বন্ধে মালা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কুঁকড়ানো শীর্ণ পা-টিকে সে মাঝে মাঝে সিধা করিবার চেষ্টা করে, দুহাতে মাঝে মাঝে পা-টিকে ঘষিতে থাকে সজোরে। জন্ম হইতে অভ্যস্ত বিকলাঙ্গটি এতকাল পরে মালাকে বিশেষভাবে কাতর করিয়াছে।

বাড়ির দক্ষিণে খানিকটা ফাঁকা জমি ছিল। গোপির বিবাহের আগে ওখানে একখানা ঘর তুলিবার কথা ভাবিতেছিল কুবের। এতকাল সময় ছিল না, হোসেনের চালানি কারবারের এখন একটু মন্দা পড়িয়াছে। বাড়িতে থাকিবার সময় পায় কুবের। চরডাঙা হইতে ফিরিবার পরদিন সে ঘর তুলিবার জন্য বাবুদের অনুমতি আনিতে গেল।

কুবের কি জানিত অনুমতির জন্য মেজোবাবুর কাছেই তাহাকে দরবার করিতে হইবে! নিচু হইয়া প্রণাম করিয়া জোড় হাতে মেজোবাবুর সামনে দাঁড়াইতে হইল কুবেরকে। করুণ কণ্ঠে জানাইতে হইল আবেদন। ঘর তুলিবে কুবের? খুব টাকা হইয়াছে নাকি কুবেরের? মেজোবাবু হাসিয়া কথা বলেন। ফরাসের সামনে মেঝেতে উবু হইয়া বসিবার অনুমতি কুবের পায় কিন্তু যুক্তকর মুক্ত করিবার নিয়ম নাই। জেলেপাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করেন মেজোবাবু। কে কেমন আছে, কার কেমন অবস্থা, কীরকম মাছ পড়িতেছে এ বছর। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজোবাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। শিক্ষা মাঝিরা পায় নাই, মাঝিদের বউ-ঝিরা শুধু পাইয়াছিল দুর্নাম, গ্রামে গ্রামে খবর রটিয়াছিল যে কেতুপুরের মেজোকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী চাখিয়া বেড়াইতেছেন—জেলেপাড়া মেজোবাবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ! আজ আর জেলেপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় মেজোবাবু পান না। মাঝিদের কারও সঙ্গে দেখা হইলে খবর জিজ্ঞাসা করেন। সকালে দুপুরে জেলেপাড়ার ভাঙা কুটিরে গিয়া সময় যাপন করিবার সময়েও যে দুস্তর ব্যবধান মাঝিদের সঙ্গে মেজোবাবুর থাকিয়া গিয়াছিল, কোনও মন্ত্রে তাহা ঘুচিবার নয়। মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালো করিবার খেয়ালে বড়োলোক কবে গরিবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছে? মেজোবাবু তো হোসেন মিয়া নয়। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নিচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভর, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা—এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরিব ছোটোলোক,

মেজোবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন? ও কাজ হোসেন মিয়ার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজোবাবুর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।

মালা? মালার কথাও মেজোবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। মালার পায়ের যে চিকিৎসা চলিতেছিল, কী হইল তার? তারপর ফাঁকা জমিটুকুতে ঘর তুলিবার অনুমতি দিয়া কুবেরকে মেজোবাবু বিদায় দিলেন।

মালা আজও মুখ ভার করিয়া ছিল। কিন্তু কৌতূহল দমন করা যায় না।

কী কইল মাইজা কত্তা?

কী কইব? তর কথা জিগাইল।

হ?

নায় তুইলা আবার তরে হাসপাতাল নিয়া যাইব কইল গোপির মা।

গোঁয়ার কি সহজ কুবের! গোঁ ধরিলে আর তো সে তাহা ছাড়িবে না! মেজোবাবুর নৌকায় মালা যে আমিনবাড়ি গিয়াছিল, কতকাল সে একথা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিবে সেই জানে, হয়তো মালা যখন বুড়ি হইয়া যাইবে, বিকল পা-টির মতো সর্বাঙ্গ শীর্ণ হইয়া আসিবে তাহার, তখনও একথা ভুলিবে না কুবের। কলহ করিয়া মালা কাঁদে। মৃত্যু কামনা করে নিজের। কিন্তু এ বিষয়ে কুবের কঠোর, নির্মম। অন্য বিষয়ে মালার সঙ্গে তাহার ব্যবহার বদলায় না, পঙ্গু অসহায় স্ত্রীর জীবন তারই বক্ষের আশ্রয়ে আজও উথলিয়া ওঠে কিন্তু আমিনবাড়ি যাওয়ার জন্য অম্লান বদনে মালাকে সে পীড়ন করে। আজ রাত্রেই হয়তো কুবের মালাকে বুকে জড়াইয়া মিঠা মিঠা কথা বলিবে, পদ্মার ঠান্ডা বাতাসে জুড়াইয়া জুড়াইয়া কি যে মধুর হইয়া উঠিবে কুবেরের ব্যবহার! কাল হয়তো আবার সে কাঁদাইবে মালাকে মেজোবাবুর কথা তুলিয়া। এমনই প্রকৃতি পদ্মানদীর মাঝির, ভদ্রলোকের মতো একটানা সংকীর্ণতা নয়, বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ।

ঘর তোলা শেষ হইতে দিন দশেক সময় লাগিল। তারপর একদিন বঙ্কুর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল গোপির।

কপিলা আসিল বিবাহে।

সে না আসিলে বিবাহের কাজ করিবে কে? মালা তো পঙ্গু।

কুবের খুশি হইয়া বলিতে লাগিল, আইছস কপিলা, আইছস? কুবের যেন ভুলিয়া গিয়াছে চরডাঙার পুকুরের জলে কী কথা তাহার হইয়াছিল কপিলার সঙ্গে। কিন্তু কপিলা সব মনে পড়াইয়া দেয়। সরিয়া সরিয়া পালাইয়া বেড়ায় কপিলা, ঢেঁকিঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া কুবের ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলে মুখ ঘুরাইয়া থাকে। এ তো ছলনা নয়, খেলা নয় কপিলার। কী যেন ভাবিয়া আসিয়াছে কপিলা এবার, বড়ো সে গম্ভীর। একটু হাসি, দুটি কথার কাঙাল কুবের, কপিলার হাসি কই, কথা কই কপিলার মুখে?

হলুদ মাখিতে মাখিতে হলদে হইয়া বিবাহ হইয়া গেল গোপির। বর-কনেকে কুবের পদ্মায় নৌকায় তুলিয়া দিল। গোপি আবার ফিরিয়া আসিবে। হোসেন মিয়ার তাড়াতাড়ি নাই। বঙ্কু ও গোপি দুমাস দেশে থাক, তাতে সে আপত্তি করিবে না।

বিবাহের পরই কপিলার ফিরিয়া যাওয়ার কথা ছিল, কী ভাবিয়া সে রহিয়া গেল। কদিন পরে শ্যামাদাস আসিয়া তাকে আকুরটাকুর লইয়া যাইবে। দিন দুই পরে কুবেরকে হোসেন মিয়ার একটা চালান আনিতে যাইতে হইল। মাইল দশেক উজানে একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে পাট বোঝাই করিল নৌকায়। তারপর দেবীগঞ্জ ফিরিয়া আসিল অনেক রাত্রে।

সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অত রাত্রে কেতুপুরে ফিরিতে রাজি হইল না। কুবেরের মন পড়িয়া ছিল বাড়িতে। নদীর ধারে ধারে সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল গ্রামের দিকে। নদীতে জেলে-নৌকার আলোগুলি ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে, মাছ ধরিবার কামাই নাই পদ্মায়। চলিতে চলিতে কত কী ভাবে কুবের। কারও ঘুম না ভাঙাইয়া কপিলাকে কি তোলা যাইবে না? আর কিছু চায় না কুবের কপিলার কাছে, গোপনে শুধু দুটা সুখ-দুঃখের কথা বলিবে। একটু রহস্য করিবে কপিলার সঙ্গে। বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কপিলা টিটকারি দিবে তাকে, ধরিয়া নোয়াইয়া দিতে গেলে বসিয়া পড়িবে কাদায়, চাপা হাসিতে নির্জন নদীতীরে তুলিয়া দিবে রোমাঞ্চ।

আর কিছুই কুবের চায় না।

কেতুপুরের ঘাটে পৌঁছাইয়া কুবেরের বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপুনি ধরিয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল কুবেরের। স্পষ্ট সে দেখিতে পাইল সাদা কাপড় পরিয়া এতরাত্রে একটি রমণী ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। কোনো দিকে মানুষের সাড়া নাই, পদ্মার জল শুধু ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আছড়াইয়া ভাঙা তীরকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, নদীর জোর বাতাসে সাদা কাপড় উড়িতেছে একাকিনী রমণীর।

ভীত কর্কশ কণ্ঠে কুবের বলিল, কেডা খাড়াইয়া আছ গো, কেডা?

নদীর দিকে মুখ করিয়া রমণী দাঁড়াইয়া ছিল, কুবেরের গলার আওয়াজে চমকাইয়া অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কেডা? মাঝি আইলা?

কুবের অবাক হইয়া বলিল, কপিলা? দুপুর রাইতে ঘাটে কী করস কপিলা?

কপিলা কাছে আসিল, বলিল, ডরাইছিলাম মাঝি!

তারপর আরও কাছে আসিল কপিলা, কুবেরের বক্ষের আশ্রয়ে সে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বড়ো বিপদ হইয়াছে আজ। আজ বিকালে হঠাৎ পুলিশ আসিয়া বাড়ি তল্লাস করিয়াছে কুবেরের, ঢেঁকিঘরের পাটখড়ির বোঝার তলে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া ঘটিটা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ি ফিরিলেই চৌকিদার ধরিবে কুবেরকে। সন্ধ্যার পর চুপিচুপি কপিলা তাই ঘাটে আসিয়া বসিয়া আছে। কুবের ফিরিলে সতর্ক করিয়া দিবে।

কুবেরের মুখে কথা সরিল না।

অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, রাসুর কাম। সব্বোনাশ করব কইছিল না রাসু—রাসুর কাম।

কী করবা মাঝি?

কে জানে কী করিবে! বিপদে-আপদে মুখ চাহিবার একজন আছে কুবেরের, তার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। ঘাটে হোসেনের নৌকা বাঁধা আছে দেখিয়া কুবের একটু আশ্বস্ত হইল।

কপিলার চোখ মুছাইয়া দিল কুবের, বলিল, বাড়িত্ যা কপিলা।

তুমি কী করবা?

হোসেন মিয়ারে বিত্তান্ত কই গিয়া, দেখি স্যায় কী কয়।

আমি লগে যামু মাঝি।

হ, বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য কপিলা। কোনোমতেই কুবের তাহাকে বাড়ি পাঠাইতে পারিল না। কুবেরের সঙ্গে সে হোসেন মিয়ার বাড়ি গেল।

হোসেনকে কিছু বলিতে হইল না, খবর সে আগেই শুনিয়াছে। লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, ময়নাদ্বীপি যাবা কুবির? চুরি আমি সামাল দিমু।

আমি চুরি করি নাই মিয়া!

তা কি হোসেন মিয়া জানে না? কিন্তু চোরাই মাল যখন বাহির হইয়াছে কুবেরের ঘরে, চোরকে সেখানে মাল রাখিয়া আসিতে কেহ যখন দেখে নাই, কে বিশ্বাস করিবে কুবেরের কথা? বাহিরের কেহ শত্রুতা করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে এমন কোনো স্থানে মাল বাহির হয় নাই, একেবারে ঘরের মধ্যে লুকানো অবস্থায় মাল পাওয়া গিয়াছে। তা ছাড়া গরিব নয় কুবের?

বিবর্ণ মুখে কুবের মাথা হেঁট করিয়া থাকে।

ঘোমটার ভিতর হইতে সজল চোখে কপিলা তার দিকে তাকায়।

একজন মুনিষ তামাক সাজিয়া দিয়া যায় হোসেনকে। তামাক টানিতে টানিতে হোসেন জিজ্ঞাসা করে, যাবা ময়নাদ্বীপি?

ঘাড় নাড়িয়া কুবের সায় দেয়।

চোখ বুজিয়া হোসেন ব্যবস্থার কথা বলিয়া চলে। আজ এই রাত্রেই রওনা হইয়া যাক কুবের। স্ত্রী-পুত্রের জন্য ভাবনা নাই কুবেরের, হোসেন রহিল। পরে গোপি আর বঙ্কুর সঙ্গে ওদের সকলকে হোসেন ময়নাদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিবে। কেন, কাঁদে কেন কুবের? ময়নাদ্বীপ তো নিজের চোখে সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে গিয়া বাস করিতে হইবে বলিয়া কান্নার কী আছে?

তামাক শেষ করিয়া হোসেন উঠিল। বাহিরের একটা ঘরে সাতজন মুসলমান মাঝি

ঘুমাইয়া ছিল, তাদের মধ্যে পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া সকলে নদীর ঘাটের দিকে চলিল। কুবের ও কপিলা চলিতে লাগিল সকলের পিছনে।

কপিলা চুপিচুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট।

কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।

কপিলা আর কথা বলে না।

ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা।

ছইয়ের মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, আমারে নিবা মাঝি লগে?

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫, ১৯ মে ১৯০৮
সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর।
পৈতৃক নিবাস : ঢাকা, বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

মৃত্যু : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩, ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬
নীলরতন সরকার হাসপাতাল, কলকাতা।

গ্রন্থ-পরিচয়

পদ্মানদীর মাঝি

গ্রন্থকাররূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব জননী উপন্যাসের মাধ্যমে (মার্চ ১৯৩৫)। রচনাকালের দিক থেকে প্রথম উপন্যাস দিবারাত্রির কাব্য বঙ্গশ্রী পত্রিকার বৈশাখ থেকে পৌষ ১৩৪১ (এপ্রিল-মে ১৯৩৪ থেকে ডিসেম্বর ১৯৩৪-জানুয়ারি ১৯৩৫) সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৩৫ সালে। একই বছরে আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় প্রথম গল্পগ্রন্থ অতসীমামী। ১৯৩৬-এর মে মাসে অপর উপন্যাস পুতুলনাচের ইতিকথা প্রকাশের পর একই বছরের ১৬ জুলাই প্রকাশিত হল লেখকের চতুর্থ উপন্যাস তথা পঞ্চম গ্রন্থ পদ্মানদীর মাঝি। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা। জ্যাকেটসহ গ্রন্থ এবং লেখকের নামাঙ্কিত কাপড়-বাঁধাই প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ + ২০৮, সাইজ ডবল ক্রাউন, মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশকাল বা প্রচ্ছদশিল্পীর উল্লেখ ছিল না। প্রথম প্রকাশকালের উল্লেখ না থাকায় Bengal Library Catalogue of Books-এ নথিভুক্ত প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় প্রকাশক / মুদ্রক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৬ জুলাই ১৯৩৬ (আষাঢ় ১৩৪৩)।

একই প্রকাশক কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১ জানুয়ারি ১৯৪২ (পৌষ ১৩৪৮)। তৃতীয় সংস্করণ-সংক্রান্ত কোনো তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। আশ্বিন ১৩৫৫ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা থেকে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ থেকে বর্তমান পঞ্চত্রিংশত্তম সংস্করণ পর্যন্ত উপন্যাসটি আশু বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত প্রচ্ছদসহ একই প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

পদ্মানদীর মাঝি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্বাশা পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ থেকে অষ্টম সংখ্যা মাঘ ১৩৪১ পর্যন্ত ৮ কিস্তি এবং চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪২-এর কিস্তিসহ মোট ৯ কিস্তিতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার পর পূর্বাশা-র প্রকাশ কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকায় উপন্যাসটির প্রকাশও অসম্পূর্ণ

থাকে এবং অবশেষে আষাঢ় ১৩৪৩-এ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পূর্বাশা-য় পদ্মানদীর মাঝির ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হওয়ার ছ-মাস পরেই ভারতবর্ষ পত্রিকায় পৌষ ১৩৪১ থেকে পুতুলনাচের ইতিকথা ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং বিরতিহীন ১২ কিস্তিতে অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সালে উপন্যাসটির প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়।

পূর্বাশা এবং পদ্মানদীর মাঝি প্রসঙ্গে 'নব পর্যায়' পূর্বাশার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার (মাঘ ১৩৭০) সম্পাদকীয় 'পূর্বাশার কথা'য় পত্রিকার পূর্ব-ইতিহাস বিবৃত করে সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য পদ্মানদীর মাঝি প্রসঙ্গে লেখেন :

> ...তাছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। তিনিও তখন প্রকাশক-মহলে অনাদৃত। রোদে পুড়ে খুবই উত্তেজিতভাবে তিনি আমাদের কোন ঠিকানায় যে এসেছিলেন মনে পড়ছে না। (কেন না, মাঝে একটা সর্প-অধ্যুষিত একতলায়, সদানন্দ রোডে এবং বুদ্ধদেব বসুর প্রতিবেশী হয়ে 'গোলাম মহম্মদ ম্যানসনে' থেকে এসেছি।) মানিকবাবুর হাতে ছিল 'পদ্মানদীর মাঝি'র পাণ্ডুলিপি। প্রকাশক-পাড়া ঘুরে এসেছেন, কেউ নিতে রাজি নন। কোন এক প্রকাশক নাকি বলেছেন : 'সময় হলে আপনার বাড়ি গিয়েই বই নিয়ে আসব।' শুনে আমি বললাম : ''তা-ই আসতে হবে ওঁদের। কিন্তু 'পূর্বাশা'কে কি আপনি দেবেন উপন্যাসটা? জানেন ত অবস্থা! বেশি টাকা দিতে পারব না। মাত্র একশো দিতে পারি।'' তিনি রাজি হয়ে দিলেন পাণ্ডুলিপি। আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে বলে গেলেন : ''আমি লিখব—দেখবেন লিখব!'' 'পদ্মানদীর মাঝি' এক সংখ্যায় বেরোতেই যাঁরা পূর্বাশার পাঠক তাঁরা মানিকবাবুর প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠলেন।...
>
> [পৃষ্ঠা ১০]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে প্রথমাবধি অধিকাংশ রচনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ-সাধনের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম পাঠ গ্রন্থরূপে প্রকাশকালে কোথাও সামান্য বা কোথাও ব্যাপক সংস্কারসাধন করেছেন। এমনকি, কিছু ক্ষেত্রে একই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের ক্ষেত্রেও এই পরিমার্জনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। পদ্মানদীর মাঝির পূর্বাশায় প্রকাশিত পত্রিকাপাঠ, গ্রন্থরূপের প্রথম সংস্করণ এবং পরবর্তী সংস্করণেও এ-জাতীয় পাঠান্তর লক্ষ করা যায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ডের (তৃতীয় সংশোধিত মুদ্রণ, জুন ২০০২) গ্রন্থ-পরিচয় অংশে প্রদত্ত এরূপ পাঠান্তরের কিছু তুলনামূলক নমুনা দ্রষ্টব্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক অনূদিত গ্রন্থ পদ্মানদীর মাঝি। বারাণসীর সরস্বতী প্রেস থেকে প্রবোধকুমার মজুমদার-কৃত একটি হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। একই বছর ত্রিচুর, কেরালার কারেণ্ট বুক থেকে মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থটির অনুবাদক শ্রীরবি বর্মা এবং ধারওয়ার থেকে প্রকাশিত কানাড়ি অনুবাদটির অনুবাদক শিবানন্দ যোশি। ১৯৬৫ সালে সম্মুখসুন্দরমের তামিল অনুবাদ প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ থেকে। গোবিন্দচন্দ্র শাহু-কৃত ওড়িয়া ভাষার অনুবাদটির প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, প্রকাশকাল ১৯৯৭। এছাড়া হিন্দি এবং অন্য দু-একটি ভারতীয় ভাষায় কয়েকটি অননুমতিপ্রাপ্ত অনুবাদ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি।

পদ্মানদীর মাঝি-র প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং Boatman of the Padma নামে ১৯৪৮ সালের মে মাসে বোম্বাই থেকে কুতুব পাবলিশার্স লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালে নিউ দিল্লির ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে অনুবাদগ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এছাড়া ইউনেসকো-র একটি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ড প্রেস, অস্ট্রেলিয়া থেকে বারবারা পেইনটার এবং ইয়ান লাভলক্-কৃত একটি ইংরেজি অনুবাদ Padma River Boatman প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৫৩ সালে স্টকহোম থেকে সুইডিশ ভাষায় প্রকাশিত Folk vid floden নামক একটি সংকলনে হুমায়ুন কবীর-এর 'নদী ও নারী' উপন্যাসসহ পদ্মানদীর মাঝি-র ভিভেকা বার্থেল-কৃত অনুবাদ (Roddare På Padma) প্রকাশিত হয়। সুইডিশ অনুবাদ-সংক্রান্ত আরও একটি তথ্য পাওয়া যায় যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি, চিঠিপত্র প্রভৃতির একটি সংকলনের নির্দেশপঞ্জি অংশে :

> ...আন্তর্জাতিক সৌহার্দ ও মানবিক ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে, মানুষ ও তার প্রতিবেশ বিষয়ে সুইডিশ ভাষায় রচিত একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থে (Över gränserna, Del 2. ইংরেজি নাম *Across the Borders*, প্রকাশক Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964), পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য থেকে নির্বাচিত রচনাংশের সঙ্গে, আধুনিক ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যের পরিচয় হিসাবে 'পদ্মানদীর মাঝি'র একটি দীর্ঘ অংশ সংকলিত হয়েছে। Ake Isling সম্পাদিত গ্রন্থটি ইউনেস্কোর জন্য সুইডিশ ন্যাশনাল কমিশনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়।
>
> [অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র—
> দে'জ পাবলিশিং, ফাল্গুন ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪০৫]

দুসান জবাভিতেল অনূদিত এবং প্রাহা-র চেসকোশ্লোভেনস্কি স্পিশোভাতেল থেকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত চেক অনুবাদটির নাম Plavec na řece Padmě। বুদাপেস্ট থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হাঙ্গেরিয় ভাষায় অনুবাদের নাম A Padma Hajósa, অনুবাদক কেলেমেন মারিয়া। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণ করে চিনা ভাষায় কুও খায় লিঅ্যান্ অনূদিত গ্রন্থটির একটি অনুবাদ পেইচিং থেকে পেইচিং রাইটার্স পাবলিশিং সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালের মে মাসে। ব্রাতিস্লাভা থেকে স্লোভাক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটির নাম Člnkár Na Rieke Padme, অনুবাদ করেছেন আনা রাকোভা ১৯৭৯ সালে। ডাচ অনুবাদ Roeier op de Padma ব্রাসেল থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়, অনুবাদক হান্নেকে রিচার্ড-নাটবে। সরল সেন-কৃত জার্মান ভাষার অনুবাদ Die Fischer vom Padma বার্লিন থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া বুলগেরিয়, নরওয়েজিয়, লিথুয়ানিয় এবং রুশ ভাষাতেও পদ্মানদীর মাঝি অনূদিত হয়, যেগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য এ-পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকাল থেকেই পদ্মানদীর মাঝিকে চলচ্চিত্রে রূপদানের একাধিক প্রয়াস নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং

বাংলাদেশের আশীর্বাদ চলচ্চিত্র-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলা ভাষায় নির্মিত পদ্মানদীর মাঝি উভয় দেশে একযোগে মুক্তি পায় ১৯৯৩-এর মার্চ মাসে। উভয় দেশের শিল্পী অভিনীত ছবিটির পরিচালক গৌতম ঘোষ। ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সালে লেখকের জীবনাবসানের অব্যবহিত পূর্বে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্থানে পদ্মানদীর মাঝি অবলম্বনে উর্দু ভাষায় নির্মিত 'জাগো হুয়া সবেরা'র পরিচালক হাফিজ কারদার। লেখকপক্ষের অজ্ঞাতসারেই চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়।

গ্রামোফোন কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া থেকে লং-প্লে রেকর্ডে রাজ্যেশ্বর মিত্র-কৃত গীতিনাট্যরূপ দিনেন্দ্র চৌধুরীর সংগীত পরিচালনায় ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। রাজ্যেশ্বর মিত্র-কৃত উপন্যাসটির একটি লোকগীতির পালারূপ দিনেন্দ্র চৌধুরীর সংগীত এবং অসিত চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিচালনায় গ্রামীণ গীতি সংস্থা কর্তৃক ১৯৯৪ সালে মঞ্চস্থ হয়। পদ্মানদীর মাঝি-র একাধিক নাট্যরূপ একাধিক নাট্যসংস্থা কর্তৃক মঞ্চে অভিনীত হয়েছে এবং আকাশবাণীর একাধিক কেন্দ্র থেকে বেতার নাট্যরূপ প্রচারিত হয়েছে।

লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত পদ্মানদীর মাঝি-র সর্বশেষ সংস্করণ (ষষ্ঠ সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬১)-এর পাঠ বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে এবং 'বাংলা আকাদেমি বানান-বিধি'-সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে।